ফ্লাইং সসার মিস্টি

চিরঞ্জীব সেন

প্রাপ্তিস্থান :
দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ
শুভ ১লা বৈশাখ ১৩৬৭

প্রাপ্তিস্থান ঃ
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদ ঃ গৌতম রায়

প্রচ্ছদ মুদ্রণ ঃ
রবি দত্ত
ইম্প্রেসন হাউস
৬৪, সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রণ ঃ
বিজয়কৃষ্ণ সামন্ত
বাণীশ্রী
১৫/১ ঈশ্বর মিল লেন
কলকাতা-৭০০০০৬

আমার ছোট্ট নাতনী

পিয়ালিমণিকে

—দাদুভাই

FLYING SAUCER MYSTERY
by
Chiranjib Sen

এই লেখকের ঃ

বারমুডা ট্র্যাঙ্গল
আবার বারমুডা ট্র্যাঙ্গল
ম্যানহাটান সিক্রেট
স্পাই অমনিবাস
গেট চার্চিল, কিল হিটলার
ডেড ড্রপ
ঘাতক
খুনী জাহাজ
আসামী ফেরার

আরম্ভ সেই ১৯৪৭ সালে।

কেনেথ আরনল্ড, মার্কিন ব্যবসায়ী। নামডাক আছে। ওপর-মহলে প্রভাব আছে। নিজের প্লেন আছে। গাড়ি যে কখানা আছে কে জানে।

একদিন নিজের প্লেন চালিয়ে দূরে এক শহরে চলেছেন। কম্পানির ডিরেকটরদের জরুরী মিটিং আছে।

আকাশ পরিষ্কার। রোদ ঝলমল করছে। দূরে মাউন্ট রেনিয়ারের মাথায় তুষারের স্তূপ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু আকাশে ওগুলো কি? প্রচণ্ড স্পিডে সার বেঁধে চলেছে? চায়ের কাপের বিরাট সাইজের কয়েকখানা ডিশ কে যেন উপুড় করে দিয়েছে আর সেইগুলো বাঁই বাঁই করে ঘুরতে ঘুরতে, তীব্র গতিতে দূর আকাশে মিলিয়ে গেল!

কেনেথ আরনল্ড বিস্ময়ে হতবাক!

এগুলি কি হতে পারে? পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও নিজের দেশে নতুন ধরনের কি প্লেন তৈরি হল তার খবর তিনি রাখেন কিন্তু এ ধরনের কোনো বিমান তৈরি হয়েছে, এমন কোনো খবর তিনি জানেন না।

কেনেথ আরনল্ড সাংবাদিকদের কাছে একটা বিবৃতি দিলেন। সেই বিবৃতি পরের দিন খবরের কাগজে ছাপা হল। তাঁর কথা কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না অথচ কেনেথ আরনল্ডের কথা উড়িয়েও দেওয়া যায় না, তাঁর কথার ওজন আছে।

বৈমানিক মহলে, পত্রপত্রিকায় ও বন্ধুমহলে বা ডিনার টেবিলে এ নিয়ে কিছু আলোচনা হল বৈকি। ব্যাপারটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ফ্লাইং সসার নামকরণটা তখনই হল।

কেউ বলল আরনল্ডের দৃষ্টিবিভ্রম হয়েছিল, কেউ বলল, ঐ সসারগুলি অন্য গ্রহ থেকে এসেছে।

কিন্তু ব্যাপারটা রহস্যজনক। সীমাহীন আকাশে তো কত রহস্য থাকতে পারে!

ফ্লাইং সসার নিয়ে আলোচনা ক্রমশঃ ক্ষীণ হতে হতে একদিন প্রায় থেমে গেল।

এক বৎসর যেতে না যেতেই মার্কিন রেডিও, টেলিভিসন, খবরের কাগজ, ডিনার টেবিল আবার মুখরিত হয়ে উঠল। এবার সকলেরই স্বর বেশ উচ্চ ও উত্তেজিত!

এবার সকলেই বলল, না, কেনেথ আরনল্ড বাজে কথা বলে নি। ঘটনাটা রীতিমতো চাঞ্চল্যকর যাকে বলে সেনসেসনাল।

তারিখটা ৭ জানুয়ারী ১৯৪৮। দুপুর শেষ হয়ে আসছে।

কেণ্টাকি রাজ্যের ম্যাডিসনভিল শহর। একটি পার্কের বেঞ্চিতে একটা গাছের নীচে বসে একজন যুবতী আকাশের দিকে চেয়ে কিছু ভাবছিল।

হঠাৎ সে দেখল আকাশে কি একটা ভেসে চলেছে। ভেসে যাচ্ছে বললে মনে হয় যে মেঘের মতো সাঁতার কেটে চলেছে। তা নয়, তীব্র গতিতে ছুটে চলেছে।

যুবতী চিৎকার করে উঠল। দুজন ছোকরা নিজেদের মধ্যে সাইকেল রেস দিচ্ছিল। যুবতীর চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে ওরাও ফ্লাইং সসারটি দেখল।

ছোকরা দু'জন আর সাইকেল থামাল না। সাইকেল চালিয়ে ওরা পার্ক থেকে বেরিয়ে জনবহুল রাস্তায় ঢুকে সাইকেল চালাতে চালাতে পথচারীদের বলতে লাগল আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, ফ্লাইং সসার, ফ্লাইং সসার!

অনেকেই দেখল। এ যে অবিশ্বাস্য !

ম্যাডিসনভিলের একজন পুলিস অফিসার ব্যাপারটা প্রত্যক্ষ করেছিল কিন্তু সে দূরবীন আনবার আগেই ফ্লাইং সসারগুলি আকাশে কোথায় মিলিয়ে গেল।

সেই পুলিস অফিসার তৎক্ষণাৎ সামরিক ঘাঁটি ফোর্ট নক্স-এ জরুরী বেতারবার্তা পাঠাল

ওয়ান অফ দোজ ফ্লাইংসসারস জাস্ট ফ্লু ওভার
হেডেড ইন ইয়োর ডিরেকশন।

এখনি একটা ফ্লাইং সসার এখান দিয়ে উড়ে গেল। সেটা তোমাদের দিকেই গেল।

অদূরে গডম্যান এয়ারবেস। এয়ারবেসের একজন পর্যবেক্ষক দূর আকাশে লাল আভা দেখতে পেয়ে কর্তাদের রিপোর্ট করল।

কর্তারা তখনি একজন দক্ষ পাইলট ক্যাপটেন টমাস ম্যান্টেলকে আদেশ দিল 'ইনভেস্টিগেট'। দেখত হে ব্যাপারটা কি ?

ক্যাপটেন ম্যান্টেল সঙ্গে সঙ্গে তার প্লেন নিয়ে উঠে পড়ল। আঠার হাজার ফুট ওপর থেকে সে বলল 'ইট লুকস্ মেটালিক······ অফ ট্রেমেণ্ডাস সাইজ' মনে হচ্ছে কোনো ধাতুর তৈরি······বিরাট আকার।

আবার একটু পরে জানাল ! "আই অ্যাম গোইং আপ টু টোয়েন্টি থাউজাণ্ড ফিট···" আমি কুড়ি হাজার ফুট ওপরে উঠছি।

এই তার শেষ কথা।

ক্যাপটেন ম্যান্টেল আর কোনো মেসেজ পাঠাচ্ছে না, ফিরেও আসছে না। সার্চ পার্টি পাঠান হল।

একখানা প্লেন ফিরে এসে রিপোর্ট করল ফোর্ট নক্সের কাছে একটা প্লেন ভেঙে পড়ে রয়েছে। এখনও আগুন জ্বলছে।

ফোর্ট নক্সকে ব্যাপারটা জানাতেই তারা লোক পাঠাল। প্লেনখানা ক্যাপটেন ম্যান্টেলের। ক্যাপটেন মৃত, দেহ তালগোল পাকিয়ে গেছে। চেনা যায় না।

ক্যাপটেন ম্যান্টেলের প্লেন কি করে ক্র্যাশ করল? কারণটা কি হতে পারে? বিমানের ধ্বংসাবশেষ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।

একটা কারণ হতে পারে যাকে বলে 'অকসিজেন ব্ল্যাকআউট' কিন্তু অক্সিজেন ব্ল্যাকআউটের ব্যাপারটা ম্যান্টেলের মতো দক্ষ পাইলটের জানা ছিল।

প্লেন ক্র্যাশের কারণ জানা গেল না এবং পনেরো মাস পরে যে সরকারি রিপোর্ট প্রকাশ করা হল তাতে বলা হল "আকাশের ঐ রহস্যজনক বস্তুগুলি সনাক্ত করা যায় নি"।

২২ জানুয়ারী ১৯৪৮ তারিখে অ্যামেরিকান অর্থাৎ ইউ এস এয়ার-ফোর্স টেকনিশিয়ানের কর্তারা একটি দলকে নিযুক্ত করলেন ফ্লাইং সসার রহস্যের খোঁজ নিতে। দলের নাম হল 'প্রজেক্ট সসার'।

ব্যাপারটা ঘটা করে প্রচার করা হয় নি। ইতিমধ্যে নাকি মার্কিন আকাশে ২৭০ বার ফ্লাইং সসার দেখা গেছে। অতএব ব্যাপারটাকে চাপা দেওয়া যায় না, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটছে।

ঐ বছরই পয়লা অক্টোবর তারিখে লেফটেনান্ট জর্জ এফ গরমান তাঁর বিমান চালিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। তিনি দেখলেন আলোর একটা রেখা আকাশের বুক চিরে জ্বলন্ত বর্ষার মতো এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে।

তিনি শুধুই আলোর রেখা দেখলেন, উৎস দেখতে পেলেন না। খসে পড়া নক্ষত্র বা উল্কা নিশ্চয় নয় কারণ সে তো পড়বে পৃথিবীর দিকে। গরমান তাঁর বিমানের মুখ ঘুরিয়ে সেই আলোর রেখাটিকে অনুসরণ করতে লাগলেন। তিনি চৌদ্দ হাজার ফুট ওপরে উঠলেন

সেই আলোর রেখা তাঁকে ঠকিয়ে আকাশের বুকে কোথায় হারিয়ে গেল।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৯ সালের শেষে ২৬ ডিসেম্বর তারিখে একজন বেলুন এক্সপার্ট বোঝালেন যে ভেনাস গ্রহে যে জীব আছে তারাই ঐ সব ফ্লাইং সসারে করে পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে। তিনি কিছু যুক্তিও দেখালেন কিন্তু তাঁর যুক্তি বিজ্ঞানীরা সরাসরি মেনে নিতে পারল না। আরও অনুসন্ধান দরকার।

পরদিনই ২৭ ডিসেম্বর মার্কিন এয়ার ফোর্স তাদের দ্বারা নিযুক্ত প্রজেক্ট সসার-এর পাট গুটিয়ে নিলেন। তাঁরা বললেন এসব হল গুজব, মাস হিস্টিরিয়া। মানুষ অনেক সময় জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।

এবং পরদিনই কি ঘটল?

নর্থ ক্যারোলিনার হ্যামলেট শহরের লোকেরা আকাশে এক বিচিত্র ধরনের বিমান-যান দেখতে পেল। তাহলে কি ফ্লাইং সসার বলে কিছু আছে? নিশ্চয় আছে। সব মানুষই কি দিনের বেলায় চোখ খুলে স্বপ্ন দেখছে নাকি? সবাই কি বোকা নাকি?

কিন্তু এরা আসছে কোথা থেকে?

ফ্লাইং সসারের সমর্থনে একজন বিজ্ঞানীর একটা প্রবন্ধ সকলকে চমকে দিল। সেই প্রবন্ধর পালটা প্রবন্ধ বেরোল। অনেক চিঠিপত্রও ছাপা হল।

একজন প্রশ্ন করলেন বিজ্ঞানী যা বলছেন তা যদি সত্য হয় তাহলে দক্ষিণ মেরুতে অভিযান চালিয়ে ব্যাপারটার এখনি অনুসন্ধান করা হক। কিন্তু কোনো অভিযান পাঠান হয় নি!

সেই বিজ্ঞানী লিখেছিলেন যে দক্ষিণ মেরুতে পর্বত গুহার ভেতরে সভ্য মানুষের বসতি আছে। এরা যে আছে তা আমরা অনেকেই জানি না কিন্তু তারা আছে। তাদের কাছে গেলেও তাদের দেখা যায় না।

কাঠি পোকা বা সবুজ ফড়িং যেমন গাছের ডালপাতার সঙ্গে

বেমালুম মিলে যায় তেমনি এইসব মানুষের দেহবর্ণ এমন যে তারাও বরফের সঙ্গে মিশে যায়, সহজে তাদের দেখা যায় না।

ওদের মধ্যে আবার একটা জাতি আছে তারা তো বরফের মতোই স্বচ্ছ। আমার পাশে এসে দাঁড়ালেও তাকে দেখতে পাব না।

সেই বিজ্ঞানী লিখেছিলেন যে এই সব মানুষেরা বিজ্ঞানে আমাদের চেয়ে পিছিয়ে নেই। তারা.চুম্বক শক্তি দ্বারা চালিত এক-রকম গোলাকার চ্যাপ্টা যান তৈরি করেছে।

বিকিনি দ্বীপে যখন অ্যাটম বোমা ফাটানো হল তখন তার কম্পন ওদের দেশেও পৌঁছেছিল। কিসের এই কম্পন? ভূমিকম্প নয়। তবে? অনুসন্ধান করবার জন্যে ওরা ওদের সেই গোলাকার চ্যাপটা উড়ন্ত যানে চেপে পর্যবেক্ষণে বেরিয়ে পড়েছে। ওদের ঐ যানগুলিকেই আমরা ফ্লাইং সসার বলছি।

দেশে একটা ঢেউ উঠল। রেডিও, টেলিভসন, সংবাদপত্র ও ডিনার টেবল এবং বাস, ট্রেন ও স্ট্রীটকার সোচ্চার। ওদিকে মাঝে মাঝে ফ্লাইং সসারের দেখাও পাওয়া যাচ্ছে। এবং নতুন নতুন কথাও শোনা যাচ্ছে।

তাদের উৎস যে কোথায়, রহস্যটা কি? তা আজও জানা যাচ্ছে না।

উৎস কি সোভিয়েট রাশিয়া?

ফ্লাইং সসারগুলি কি সোভিয়েট রাশিয়া থেকে আসছে?

সন্দেহটা মাথায় প্রথম ঢুকিয়ে দিলেন লিও বেঞ্জ। লিও বেঞ্জের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মোটর এঞ্জিন নির্মাতারূপে তাঁর প্রচুর খ্যাতি। প্রথম সারির মান্যবর ব্যক্তি একজন।

বেঞ্জ বললেন যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগে তাঁকে গোপনে একটা স্পেস ক্র্যাফট দেখানো হয়েছিল। তার আকৃতি অনেকটা

এখনকার ফ্লাইং সসারের মতো তবে তখন সেটা সবে প্রাথমিক পর্যায়ে। আকাশে খানিক দূর পর্যন্ত উড়িয়ে তাঁকে দেখানো হয়েছিল। সবই অবশ্যই গোপনে।

জিনিসটা একটা চাকীর মতো। লাড্ডুর মতো বোঁ বোঁ করে ঘুরতে ঘুরতে আকাশে উড়তে পারত। এই উড়ন্ত চাকী যিনি পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি বেঞ্জকে অনুরোধ করেছিলেন যে তিনি যেন ব্যাপারটা কোথাও প্রকাশ না করেন।

তাঁর নাম কি? নাম জর্জ ডি বে। সেই উড়ন্ত চাকীর বিস্তারিত নকশা যাকে বলে ব্লু প্রিন্ট তিনি তা লিও বেঞ্জকে দেখিয়েছিলেন। নকশা দেখে বেঞ্জ বুঝেছিলেন যে এইরকম একটা চ্যাপটা ধরনের উড়ন্ত চাকীর সম্ভাবনা আছে, এই চাকী আকাশে উড়তে পারে। এ নিয়ে আরও পরীক্ষা করতে হবে। আরও গবেষণা করতে হবে।

তাহলে সেই জর্জ ডি বে এখন কোথায়? মহাযুদ্ধে মারা যায় নি তো? শত্রুর হাতে কোথাও এখনও বন্দী হয়ে আছে নাকি? কোনো কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে? নাকি তিনি কোথাও আত্মগোপন করে আছেন? লিও বেঞ্জকে অনেকে প্রশ্ন করল।

লিও বেঞ্জও ঠিক জানেন না। ডি বে যে ঠিকানা দিয়েছিল সেই ঠিকানায় এতদিন পরে তাকে পাওয়া গেল না, কেউ বলতেও পারল না লোকটা কোথায় গেছে।

লিও বেঞ্জই একটা উত্তর দিলেন। তিনি বললেন যে কথাবার্তায় তিনি লোকটার সোভিয়েট প্রীতি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ডি বে সেভিয়েট রাশিয়াতে যুদ্ধের আগে চলে গেছে এবং সেখানেই আছে।

তাহলে কি রাশিয়নরা ডি বে-এর সহায়তায় এইসব ফ্লাইং সসার তৈরী করে মার্কিন আকাশে পঠাচ্ছে? উদ্দেশ্য আমাদের কিছু মিলিটারি সিক্রেট জেনে নেওয়া?

ফ্লাইং সসারগুলির গতি প্রচণ্ড। তাদের নাগাল পেতে পারে এমন আকাশ যান এখনও তৈরি হয় নি। তাদের অনুসরণ করে ধরা যাবে না, রাশিয়ানরা ফ্লাইং সসারে বসে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি বা কলকারখানার ফটো তুলে ঝটপট সরে পড়ছে।

রাশিয়া সম্বন্ধে একজন মার্কিন বিশেষজ্ঞ বলল যে ডিজাইন পেলেও রাশিয়ানরা ফ্লাইং সসার তৈরি করতে পারবে না কারণ ফ্লাইং সসার তৈরি করার মতো উন্নত ধরনের সাজসরঞ্জাম বিশিষ্ট কারখানা তাদের নেই।

একজন রাজনীতিক ভাষ্যকার বললেন যে রাশিয়ানরা এত বোকা নয়। তারা যদি ফ্লাইং সসার তৈরি করেই থাকে তাহলে তারা তা অ্যামেরিকার আকাশে পাঠাবে না কারণ একটি সসার যদি ক্র্যাশ করে তাহলে সেই ভাঙা সসার দেখে আমরা তো তাদের গুপ্ত কৌশল জেনে যাব। না ওরা তা করবে না।

তবে শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত হল যে ফ্লাইং সসার তৈরি করা সম্ভব নয় তবুও রাশিয়া এ বিষয়ে কিছু করছে কি না জানবার জন্য অ্যামেরিকা থেকে গুপ্তচর পাঠান হক।

ফ্লাইং সসার রহস্য ক্রমশঃ বেশ দানা বেধে উঠল। সরকার মহল আর বিজ্ঞানী মহল জনসাধারণের অগোচরে নানারকম খোঁজ খবর করতে লাগলেন।

সসার সম্বন্ধে যে সব গুজব তাদের কানে আসে তার প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালানো হয়। কিন্তু কি গুজব শোনা গেল বা কি করা হল তা তারা প্রচার করেন না

বর্ডারল্যাণ্ড সায়েন্স রিসার্চ হল বিজ্ঞানীদের একটি গোষ্ঠি। তারা বলল পৃথিবী এবং ভেনাস গ্রহের মধ্যে সাতটা 'গ্রহানু' বিচরণ করে। তাদের মধ্যে একটার নাম হল এথিরিয়া।

এথিরিয়াতে মানুষের মতোই কিন্তু মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান জীব বাস করে। অ্যাটম বোমা ফাটবার আগে পর্যন্ত এথিরিয়ার বিষয়

আমরা কিছু জানতুম না।

পৃথিবীতে অ্যাটম বোমা ফাটবার পর এথিরিয়ানরা চঞ্চল হয়েছে তায় তাদের অস্তিত্ব আমরা টের পেয়েছি। আলাস্কায় আমাদের যে বিরাট রাডার স্ক্রীন আছে তারই সাহায্যে এথিরিয়ানদের ক্রিয়াকলাপের আভাস পাওয়া যায়।

ঐ আভাসের একটা রূপরেখাও দেওয়া গেল মাউন্ট প্যালোমারে বিরাট ও শক্তিশালী দূরবীন বসাবার পর। এথিরিয়া এবং আরও ছ'টি গ্রহানু যে মহাশূন্যে বিচরণ করছে তাও জানা গেল।

অ্যাটম বোমা ফাটাবার পর এথিরিয়ানরা আর্থ সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠল। ইস্পাতের চেয়েও মজবুত একরকম ধাতু দ্বারা তারা স্পেস শিপ তৈরি করেছে। মহাশূন্যে চুম্বকরেখা অনুসরণ করে তারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করেছে।

বর্ডারল্যাণ্ডের লোকেরা বলল যে তারা রাত্রে এথিরিয়ানদের আকাশ যান দেখেছে। লাল আর সবুজ উজ্জ্বল আলোর রেখা পিছনে ফেলে তারা দ্রুতগতিতে কোন অজানা রাজ্যে চলে যায়। দিনের বেলাতেও তাদের দেখা গেছে। কখনও তাদের ধীরগতিতে যেতে দেখা যায় না। কি ধরনের আকাশ যান, কিসের সাহায্যে চলে, কিছুই অনুমান করতে না পেরে ওগুলির নাম দেওয়া হয়েছে ফ্লাইং সসার।

বর্ডারল্যাণ্ড সায়েন্স অ্যাসোসিয়েটদের এই হল সিদ্ধান্ত। তাদের এই সিদ্ধান্ত টিকবে কি না কে বলতে পারে?

১৯৫০ সালে সারা অ্যামেরিকা জুড়ে ঐ সকল উড়ন্ত চাকী নিয়ে তর্ক বিতর্কের ঝড় বইতে আরম্ভ করল।

তর্কবিতর্কের উৎস হল একখানি বই, নাম বিহাইণ্ড দি ফ্লাইং সসারস এবং লেখকের নাম ফ্রাংক স্কালি। লেখক ফ্রাংক স্কালি নাকি ফাঁকা মাঠে তলোয়ার ঘোরান নি। তিনি যা লিখলেন তা অত্যন্ত

চাঞ্চল্যকর। বিশ্বাস করুন আর না করুন, স্কালি সাহেব যা বলেছেন তা নাকি খাঁটি সত্য।

এইচ জি ওয়েলসের দি ওয়ার অফ দি ওয়ার্ল্ডস-এর পর এমন বই আর প্রকাশিত হয় নি। প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিহাইণ্ড দি সসারস তুমুল সাড়া জাগিয়ে তোলে।

মূলতঃ মার্কিন সরকারের সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত প্রজেক্ট সসারের রিপোর্টকে আক্রমণ করে বইখানি লেখা। বইখানিতে কোনো অনুমান বা কল্পনাকে স্থান দেওয়া হয় নি। বলা হয়েছে যা সত্য এবং যা ঘটেছে তারই ওপর ভিত্তি করে বইখানি লেখা হয়েছে।

ফ্রাংক স্কালি একজন বিজ্ঞানীর কথা বলেছেন কিন্তু কোথাও তার আসল নাম উল্লেখ করেন নি। একটি ফ্লাইং সসার ও তার আরোহী-দের দেখবার সুযোগ এই বিজ্ঞানীর ঘটেছিল।

১৯৪৯ সালের কোনো এক তারিখে নিউ মেক্সিকোর অজটেক নামক স্থানে একটি ফ্লাইং সসার বিকল হয়ে পড়ে গিয়েছিল কিন্তু ভাঙে নি।

সেই ফ্লাইং সসারে ১৬ জন আরোহী ছিল। প্রত্যেকটি আরোহীর চেহারা মানুষের মতো কিন্তু কারও উচ্চতা ৪২ ইঞ্চির বেশি নয়। প্রত্যেকের পরিধানে নীল রঙের পোযাক তবে পোশাকে কোনো পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন বা সংখ্যা ছিল না।

আরোহীরা সকলেই মৃত। প্রাণের কোনো সাড়া পাওয়া যায় নি।

সসারটির ব্যাস ৯৯.৯ ইঞ্চি। ভেতরে একটি কেবিন আছে। কেবিনের উচ্চতা ৭২ ইঞ্চি এবং আর যা কিছু মাপজোপ সবই ৯ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যাবে।

কোথাও নাট বলটু বা রিভেট নেই, কঠিন কোনো ধাতু দিয়ে তৈরি। সে ধাতু যে কি তা ধরা যায় নি অন্ততঃ সে রকম কোনো ধাতু পৃথিবীতে পাওয়া যায় না। ধাতুটি প্রচণ্ড তাপসহ।

সিগারেটের প্যাকেটের আকারে একটি ছোট্ট রেডিওসেট পাওয়া গেছে। খাবারের মধ্যে ছিল এক রকম বিস্কুট, কিছু জলও ছিল।

সসারটিকে ভালো করে পরীক্ষা করে বলা যেতে পারে যে এটি চুম্বক শক্তি দ্বারা চালিত হয়। যারা এই সসারের চালক তারা বিজ্ঞানে আমাদের চেয়ে পাঁচশ বছর এগিয়ে আছে বলে মনে করা হচ্ছে। একটি পুস্তিকা পাওয়া গেছে তার ভাষা দুর্বোধ্য।

আরোহীদের একজনের মৃতদেহ মার্কিন এয়ারফোর্সের ডাক্তাররা ময়না তদন্ত করে দেখে বলেছেন যে পার্থিব মানুষের সঙ্গে তাদের কোনো তফাত নেই। তবে তাদের দাঁত আমাদের চেয়েও মজবুত। তাদের যে কিসে মৃত্যু হল তা জানা যায় নি। হয়তো চুম্বক শক্তির তারতম্যের ফলে।

বিষদভাবে পরীক্ষার জন্যে সসারটি কোনো একটি বিখ্যাত ল্যাব-রেটরিতে নাকি রাখা আছে। ল্যাবরেটরির নাম গোপন রাখা হয়েছে। নাম প্রকাশ করলে এত ভিড় হবার সম্ভাবনা যে কাজ করাই যাবে না।

সেই অজ্ঞাত বিজ্ঞানীকে প্রশ্ন করে জানা গিয়েছিল যে এই সসারটি ভেনাস থেকে এসেছে অন্ততঃ তাই তাঁর অনুমান। হতে পারে সসারগুলি এথিরিয়া, ভেনাস বা অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসছে কিন্তু সেই সব গ্রহে কি আমাদের মতোই মানুষ আছে? যারা বিস্কুট খায়, জল পান করে, বই ছাপায়? তাদের সভ্যতাও কি পৃথিবীর মতো?

পৃথিবীতে অভিব্যক্তি এবং সভ্যতার উন্মেষ যে ভাবে হয়েছে সেই সব গ্রহেও কি ঠিক সেইভাবেই হয়েছে? জানি না এই প্রশ্নের উত্তরে সেই অজ্ঞাত বিজ্ঞানী কি বলেছেন তবে স্কালির বইয়ে তার কোনো উল্লেখ নেই।

ফ্লাইং সসার যে আছে সেটা ঠিক। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বহু ব্যক্তি তাদের দেখেছে, অনেকে ফটোগ্রাফও তুলেছে। এই যেমন

১৯৫০ সালের ২৭ এপ্রিল তারিখে টিডব্লুএ বিমান কম্পানির একজন প্রবীন পাইলট আকাশে একটি জ্বলন্ত লাল বল দেখতে পান।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কো-পাইলট রবার্ট অ্যাডিকেসকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ ওটা কি বল তো? শুনেছি মার্স গ্রহ নাকি লাল কিন্তু মার্স কি আমাদের এত কাছে? তা ছাড়া ওটা একটা জ্বলন্ত পিণ্ড বলে মনে হচ্ছে।

অ্যাডিকেস ভয় পেয়ে গেল। সে তখনি চিকাগো কন্ট্রোল টাওয়ারকে জিজ্ঞাসা করল এধারে কাছাকাছি কোনো প্লেন উড়ছে কি না।

কন্ট্রোল টাওয়ার উত্তর দিল, না, ওদিকে কোনো প্লেন নেই। অ্যাডিকেস তখনই বিমানের যাত্রীদের ব্যাপারটা জানিয়ে সতর্ক করে দিল আর পাইলট ম্যানিং ব্যাপারটা কি দেখবার জন্যে সেই অগ্নি-গোলকের দিকে প্লেন ঘোরাল।

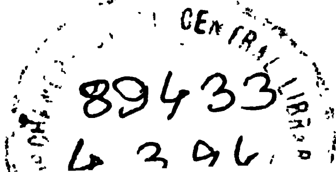
কিন্তু সেই অগ্নি-গোলকের গতি প্রচণ্ড। ম্যানিং তার নাগাল পেল না। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সেই গোলক মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিমানের যাত্রীরাও অগ্নি-গোলকটা দেখেছিল। ম্যানিং এবং কয়েকজন যাত্রী বলল যে ওটা একটা ফ্লাইং সসার। এই ঘটনার পরে অ্যামেরিকার বিভিন্ন স্থানে আরও সসার দেখা গেল।

একটি সাময়িক পত্রিকা একটি স্কুপ নিউজ প্রকাশ করল। এই সংবাদ অ্যামেরিকার আর কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত হয় নি। সেই পত্রিকা জানাল যে ফ্লাইং সসারগুলি অ্যামেরিকান নেভি তৈরি করছে। চাঞ্চল্যকর খবর।

আর এই খবরেরই পায়ে পায়ে শোনা গেল যে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান একটি বিবৃতি দেবেন।

প্রেসিডেন্টে বিবৃতি দেবেন। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। প্রেসিডেন্ট তখন ছিলেন ফ্লোরিডার কি-ওয়েস্ট নামক শহরে সামার হোয়াইট হাউসে।



দলে দলে রিপোর্টাররা প্রেসরুমে জমায়েত হল। অথচ প্রেসিডেন্ট নিজে কিছু জানেন না। রিপোর্টাররা প্রেসিডেন্টের প্রেস সেক্রেটারিকে নানা প্রশ্ন করে। তিনিও কিছু জানেন না।

যাইহক তিনি তখন প্রেসিডেন্টকে রিপোর্টারদের আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্টের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে প্রেস সেক্রেটারি প্রেসিডেন্টের বক্তব্যজানিয়ে ছিলেন, না, প্রেসিডেন্ট ফ্লাইং সসার সম্বন্ধে কিছু জানেন না এবং এ দেশে তৈরি হচ্ছে বলেও তাঁর কিছু জানা নেই। অতএব রহস্য আরও জটিল হল।

ফ্লাইং সসার এদেশে যখন তৈরি হচ্ছে না তখন ওগুলি নিশ্চয় অন্য গ্রহ থেকে আসছে। বাস্তবিক ইদানিং তাদের আনাগোনা যেন বেড়ে গেল।

বিখ্যাত মার্কিন রেডিও ভাষ্যকার হেনরি জে টেলর বললেন যে ফ্লাইং সসার বাস্তব, ওকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না কারণ ফ্লাইং সসার এই পৃথিবীতেই তৈরি হচ্ছে। মার্কিন সামরিক বিভাগ অ্যাটম বোমা তৈরির সময় ম্যানহাটান প্রজেক্টের মতো সমস্ত ব্যাপারটা গোপন রেখেছেন।

মাত্র একরকম ফ্লাইং সসার নেই, কয়েক রকমের আছে। টেকসাসের গ্যালভেসটন বে নামে স্থানে একটি সসার পাওয়া গিয়েছিল যার ব্যাস ২৫০ ফুট।

টেলর সাহেব বললেন, আপনি যদি ফ্লাইং সসার পান, পাওয়া অবশ্য শক্ত কারণ যে ধাতু দিয়ে এগুলি তৈরি সেই ধাতু সহজেই বিনষ্ট হয়ে যায়, তবুও যদি পান তাহলে হয় তো দেখবেন তার ওপরে কোনো জায়গায় লেখা আছে ঃ

Military Secrect of the United State\
Of America. Air forces
(এখানে একটি সংখ্যা থাকবে) .সা

Anyone damaging or revealing descripti... or whereabouts of this missile is subject to prosecution by the United States Govetnment. Call collect at once

(নীচে থাকবে টেলিফোন নম্বর এবং একটি ইউ এস এয়ারবেসের ঠিকানা।)

NON-EXPLOSIVE

স্কালি সাহেব যা বলেছিলেন বা যে সব তথ্য সরবরাহ করেছিলেন তার সঙ্গে টেলর সাহেবের তথ্য কিছুই মেলে না তবে উভয় পক্ষের বক্তব্য বিচার করলে কিছু সত্য হয়তো পাওয়া যেতে পারে।

মার্কিন সামরিক বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত প্রজেক্ট সসার কর্তৃক সমস্ত ব্যাপারটা হালকাভাবে উড়িয়ে দেবার প্রচেষ্টা দেখে মনে হয় মার্কিন সামরিক বিভাগ এ বিষয়ে সম্ভবতঃ কিছু জানেন। যে কোনো কারণে হক ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইছেন।

মোট কথা রহস্য যেন বেশ ঘনীভূত হয়ে উঠেছে।

স্কালি সাহেবের বই টেক্কা মেরে আর একখানা বই প্রকাশিত হল। এই বইখানির নাম 'ফ্লাইং সসারস হ্যাভ ল্যাণ্ডেড'। বইখানার লেখক দুজন। একজনের নাম ডেমণ্ড লেসলি অপরজনের নাম জন অ্যাডামস্কি। বইখানি প্রকাশিত হয়েছে লণ্ডনে এবং প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল।

সারা পৃথিবীতে বহু দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা ও মিস্টার ও সারাংশ প্রকাশিত করেছে। রীতিমতো হৈ চৈ পড়ে গেল। ঈই-

সত্যিই কি ফ্লাইং সসার পৃথিবীর মাটিতে নেমেছে? কোথা থেকে তারা এল? কোথায় নামল?

বইখানির অপর লেখক জন অ্যাডামস্কি লিখেছেন যে একটা ফ্লাইং সসার শুক্র গ্রহ থেকে এসেছিল। সেই অদ্ভুত সসারে শুক্র গ্রহের অর্থাৎ ভেনাসের একজন মানুষ ছিল। আমেরিকার কোনো এক পাহাড়ী অঞ্চলে সেই মানুষের সঙ্গে অ্যাডামস্কির বাক্য বিনিময় হয়েছে তবে সাংকেতিক ভাষায়।

প্রমাণ? অ্যাডামস্কির ছজন বন্ধু সাক্ষ্য দেবে। যাইহক অ্যাডামস্কির বিবৃতিতে পরে আসছি।

লেসলি ও অ্যাডামস্কির বইয়ের প্রকাশক বলেছেন যে অ্যাডামস্কি ৬২ বৎসর বয়স্ক একজন দার্শনিক। কালিফোরনিয়ার প্যালোমারে তিনি বাস করেন। গত বিশ বৎসর যাবত তিনি মহাকাশ পর্যবেক্ষণ করছেন। সসার নিয়েও গবেষণা করছেন। শুক্র গ্রহের মানুষটির পায়ের ছাপ অ্যাডামস্কি নাকি প্লাস্টারে তুলে নিয়েছেন।

আকাশের দিকে খালি চোখে দিবারাত্র চেয়ে থাকা অভ্যাস ছিল অ্যাডামস্কির। দুটি দূরবীণ ছিল তাঁর। খালি চোখে চেয়ে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ যখন ক্লান্ত হত তখন তিনি দূরবীণে চোখ লাগাতেন।

অ্যাডামস্কি প্রথম ফ্লাইং সসার দেখেন ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দূরবীণ আছে মাউন্ট প্যালোমারে। মাউন্ট প্যালোমারের সেই অবজারভেটরির ওপর সেই ফ্লাইং সসারটি চক্কর মারছিল।

পরের বছর অগস্ট মাসে আবার। এক শুক্রবার সন্ধ্যাকাশে একটি নয়, এক ঝাঁক ফ্লাইং সসার তাঁর নজরে আসে, ঐ একই আকাশে, মাউন্ট প্যালামারের ওপরে।

ফ্লাইং সসারের সেই ঝাঁক একটা নিয়ম মেনে নির্দিষ্ট পথ ধরে উড়ছিল। সেগুলি এত নীচু দিয়ে উড়ছিল যে অ্যাডামস্কি সসার-গুলির চুড়ো এবং চুড়ো ঘিরে একটা চাকতির আভাস দেখতে পাচ্ছিলেন।

আকাশের দিকে চেয়ে থাকা তাঁর একটা নেশায় দাঁড়িয়েছিল। তিনি নাকি এত ফ্লাইং সসার দেখেছেন যে তার হিসেব রাখতে পারেন নি।

এখন প্রশ্ন হল অ্যাডামস্কি একা এত সসার দেখলেন কি করে? অন্য এলাকায় বা অন্য দেশের আকাশে কি তাদের দেখা যায় না?

উত্তরে অ্যাডামস্কি বলেন যে ফ্লাইং সসারগুলি সম্ভবতঃ আকাশে অদৃশ্য চুম্বক রেখা অনুসরণ করে চলে। তিনি অনুমান করেন যে ক্যালিফোরনিয়ার আকাশের ওপর নিশ্চয়ই এমন একটি চুম্বক ক্ষেত্র আছে যেটিকে ফ্লাইং সসারদের পক্ষে এড়িয়ে চলা মুশকিল।

শুক্র গ্রহের ইংরেজি নাম হল ভেনাস। ভেনাসের মানুষকে বলা হয় 'ভেনি'। অ্যাডামস্কি একজন ভেনির সঙ্গে বাক্য বিনিময় করেছিলেন। অ্যাডামস্কি লিখেছেন ঃ

১৯৫২ সালের ২০ নভেম্বর বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় আমি অন্য একটি গ্রহের 'মানুষের' দেখা পাই। আমিই বোধ-হয় একমাত্র ব্যক্তি যার এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই 'মানুষ' একটি ফ্লাইং সসার চেপে এই পৃথিবীতে অবতরণ করেছিল। সেই মানুষ তার সসারটিকে একটি পর্যবেক্ষণকারী বিমান বলেছিল।

সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ক্যালিফোরনিয়ার মরুভূমিতে, আরিজোনার পার্কার নামক শহরের পথে, ডেজার্ট সেণ্টার থেকে মাইল দশেক দূরে।

আমি আমার ছজন বন্ধুর সঙ্গে সেখানে বেড়াতে গিয়েছিলুম। মনে একটা ক্ষীণ আশা ছিল দৈবাৎ একটা ফ্লাইং সসার চোখে পড়ে যেতেও পারে।

আমার সেই ছজন বন্ধুর নাম হল উইনলো শহরের মিস্টার ও মিসেস বেইলি, প্রেস্টকট শহরের মিস্টার ও মিসেস জর্জ এইচ উইলিয়মসন। উইনলো আর প্রেস্টকট আরিজোনা স্টেটে। আর সঙ্গে ছিলেন প্যালামার গার্ডেনের মিসেস অ্যালিস কে ওয়েলস। আমি নিজে প্যালোমার গার্ডেনে বাস করি, ওখানে আমার নিজস্ব একটি মানমন্দির আছে। মানমন্দিরে আমার নিজের তুটি দূরবীন আছে। এই পাঁচজন ছাড়া সঙ্গে ছিলেন আমার সেক্রেটারি মিসেস লুসি ম্যাকগিনিস।

সেদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। এখানে ওখানে তু এক টুকরো মেঘ উড়ে বেড়াচ্ছিল। নীল পাহাড়গুলি যদিও অনেক দূরে তবুও মনে হচ্ছিল পাহাড়গুলি যেন কাছেই রয়েছে।

আমরা কেউ না কেউ আকাশের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিলুম যদিই ভাগ্যক্রমে একটা সসার নজরে পড়ে।

তখন বারোটা বেজে গেছে। আমি প্রস্তাব করলুম যে গাড়ি থেকে নেমে এবার একটু এদিক ওদিক বেড়ানো যাক। আমার প্রস্তাব সকলে মেনে নিল। গাড়ি থেকে নেমে আমরা বেড়াতে আরম্ভ করলুম।

আমাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

কিছুক্ষণ পরে আমরা বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ যেন একই সঙ্গে কাছের পাহাড়টার মাথার ওপর চেয়ে দেখলুম। হ্যাঁ, ঐ তো!

আমাদের সকলের চোখ বড় বড় হয়ে উঠল। এ আমরা কি দেখছি? আমাদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি নিশ্চয়। আমরা দেখলুম বর্মা চুরুটের আকারের মতো ঝকমকে রুপোলি একটা বিমান নিঃশব্দে হাওয়ায় ভেসে যাচ্ছে। তার নেই কোনো ডানা, নেই কোনো প্রোপেলার, কিছুই নেই। মনে হল বিরাট সেই বর্মা চুরুট যেন নামবার চেষ্টা করছে, উপযুক্ত ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড খুঁজে বেড়াচ্ছে।

আমাদের সঙ্গে শক্তিশালী তুটি বাইনোকিউলার ছিল। সে তুটি

দ্রুত হাত ঘুরতে লাগল। আমাদের মধ্যে জর্জ উইলিয়মসন দীর্ঘকাল এয়ারফোর্সে ছিল। সে সেই অজানা আকাশযানের গায়ে এমন একটি কালো দাগ লক্ষ্য করল যা সে কোনো দিনই কোনো বিমানের গায়ে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নি।

আমরা সকলেই তখন বেশ উত্তেজিত। কারও মুখ থেকে কথাটি সরছে না। ওরই মধ্যে আমি বলে উঠলুম

—আমাকে কেউ শীগগির মোটরে করে একটু এগিয়ে দিয়ে এস। ঐ আকাশযানে আমারই জন্যে এসেছে। আমি ওদের দাঁড় করিয়ে রাখতে চাই না।

আমি কেন এবং কি জন্যে কথাগুলি বলেছিলুম তা আমি বলতে পারবো না কিন্তু কথাগুলি আমি বলেছিলুম। আমার মনের ভেতর থেকে কেউ যেন কথাগুলি বলিয়ে দিল।

আমার সেক্রেটারি লুসি আমাকে গাড়িতে চাপিয়ে এগিয়ে নিয়ে চলল। গাড়ির পিছনের কাঁচের ভেতর দিয়ে আমি সেই অজানা আকাশযানটিকে দেখতে পাচ্ছি। সে যেন আমাদের গাড়িটি অনুসরণ করছে।

গাড়ি থেকে নেমেই আমি লুসিকে সঙ্গীদের কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে বললুম কিন্তু তারা সকলে যেন আমার দিকে লক্ষ্য রাখে।

মিনিট পাঁচ মাত্র পার হয়েছে। আকাশের গায়ে একটা উজ্জ্বল দীপ্তি লক্ষ্য করলুম আর প্রায় সেই মুহূর্তেই দেখলুম একটি চাকতি দুটি পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে নীচে নেমে আসছে।

দুরবীন দিয়ে তাড়াতাড়ি দেখে নিয়ে আমার ক্যামেরা দিয়ে পরপর দ্রুত সাতখানি ছবি তুলে নিলুম। উত্তেজনায় দেখতে ভুলে গিয়েছিলুম আগে ক্যামেরা ফোকাস করা আছে কি না।

তারপর দেখি কি যে আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেখান থেকে সিকি মাইল আন্দাজ দূরে দুটি অনুচ্চ পাহাড়ের সরু প্রবেশ মুখে

একজন 'মানুষ' দাঁড়িয়ে আছে। সে আমাকে ইসারা করে তার কাছে যেতে বলছে।

তার কাছে এগিয়ে যাবার সময় কি রকম একটা অদ্ভুত অনুভূতি আমার দেহমন আচ্ছন্ন করে তুলল। একটু শংকিত হলুম কিন্তু জানি যে আমার বন্ধুরা আমার ওপর দৃষ্টি রাখছে। মানুষটার কাছে পৌঁছতে দুটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলুম। তার পরনের ফুলপ্যান্ট আমার মতো নয়, অনেকটা স্কি-প্যান্টের মতো এবং তার মাথার চুল লম্বা, হাওয়ায় সেগুলি দুলছে।

যদিও তখনও সেই অদ্ভুত অনুভূতি আমার দেহমন আচ্ছন্ন করে রেখেছে তথাপি আমার মনে যেন একটু সাহস উঁকি দিল। সেই মানুষটি একজন যুবক, হাস্যময়। বুঝলুম আমাকে সে বন্ধুভাবেই আহ্বান করছে। আমি নির্ভয়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম।

আমি স্বপ্ন দেখছি না নিশ্চয়। আমি অন্য একটি গ্রহের বাসিন্দার সামনে দাঁড়িয়ে! উত্তেজনায় আমার সারা দেহ কাঁপতে লাগল। আমার চিন্তাশক্তি যেন লুপ্ত হয়ে গেল।

অন্য গ্রহের বাসিন্দা, অপরিচিত হাস্যময় সেই যুবক আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পেরে আমার দিকে তার ডান হাত বাড়িয়ে দিল।

আমরা যেভাবে হ্যাণ্ডশেক করি সেই যুবক সেভাবে হ্যাণ্ডশেক করল না। সে আমার হাতের ওপর তার হাত উবুড় করে স্পর্শ করল মাত্র।

এইবার লোকটিকে ভাল করে লক্ষ্য করলুম। লম্বায় বোধহয় পাঁচফুট ছ ইঞ্চি হবে আর ওজন কত হবে? ১৩৫ থেকে ১৪০ পাউণ্ড। বয়স তিরিশের বেশি নয়।

মুখ গোল, কপাল বেশ চওড়া, চোখ উজ্জ্বল, বেশ বড়, তারার রং ধুসর-সবুজ। গালের হাড় সুস্পষ্ট, খাঁড়ার মতো নাক। গায়ের রং বাদামী, রৌদ্রতপ্ত ত্বকের মতো। মাথার চুল কিন্তু কালো নয়,

বালির মতো রং।

তার পরিচ্ছদ এক টুকরো কাপড় থেকে তৈরি, বাদামী রং-এর। তবে মনে হয় সেটি তাদের ইউনিফর্ম কিন্তু পোশাকের কোথাও কোনো সেলাই বা বোতাম দেখতে পেলুম না। জুতোর রং অক্স-ব্লাড তবে চামড়ার জুতো নয়, অপর কোনো পদার্থের তৈরি।

অনুভব করলুম সময় পার হয়ে যাচ্ছে। আর বেশিক্ষণ থাকতে পারবে না। আমাদের আবহাওয়ায় সে অশ্বস্তি বোধ করছে। আমি তাকে ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করলুম

তুমি কোথা থেকে আসছ?

সে মাথা নাড়ল। আমার প্রশ্ন বুঝতে পারে নি।

আমার স্থির বিশ্বাস যে পরস্পরের ভাষা না জানলেও কথা বলা বা ভাবের আদান-প্রদানে কোনো অসুবিধে হয় না। ইসারা ইঙ্গিত অথবা অনুভূতি বা টেলিপ্যাথি দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে কথা বলা যায়।

আমাদের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে অসুবিধে হল না।

আমি তাকে সূর্য দেখালুম। সে ঘাড় নেড়ে জানাল বুঝেছে। তখন সূর্যকে কেন্দ্র করে আমি কাল্পনিক একটি বৃত্ত টেনে উচ্চারণ করলুম নেপচুন, তারপর ঐ রকম আরও একটি বৃত্ত টেনে বললুম 'ভেনাস,' তারপর আরও একটি বৃত্ত টেনে উচ্চারণ করলুম 'আর্থ' এবং ইঙ্গিত করলুম যে এরই ওপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি।

এই ব্যাপারটির আমি পুনরাবৃত্তি করলুম। এইবার সে বুঝল। সে সূর্যকে দেখিয়ে একটি বৃত্ত আঁকল তারপর আরও একটি বৃত্ত। এবার সে বাঁ হাত দিয়ে নিজেকে এবং ডান হাতের তর্জনি দিয়ে দ্বিতীয় বৃত্তটি দেখাল।

আমি বুঝলুম এই দ্বিতীয় বৃত্তপথে যে গ্রহ সেই গ্রহই তার বাসভূমি। প্রশ্ন করলুম

তুমি বুঝি ভেনাস থেকে আসছ?

ভেনাস কথাটি এইবার নিয়ে তিনবার উচ্চারণ করলুম। সেও ঘাড় নেড়ে বলল 'ভেনাস'। কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ এবং মনে হল যেন এক-জন প্রবীন ব্যক্তি কথা বলল।

এরপর তার সঙ্গে আমার আকারে ইঙ্গিতে অনেক কথাবার্তা হল। তার কাছ থেকে জানলুম যে আরও অনেক গ্রহে আমাদের মতো মানুষ বাস করে। তারা পৃথিবীতে আগেও অনেকবার এসেছে আবার আসবে।

একটি বিরাট আকাশযানে তারা পৃথিবীর আকাশে আসে। সেই আকাশযানে ছোট ছোট আকাশযান থাকে। সেই আকাশযানে চেপে তারা পৃথিবী পরিক্রমায় বেরোয় তবে আকাশে যে সব উড়ন্ত চাকতি দেখা যায় সেগুলি চালকবিহীন। সেগুলি বড় আকাশ-যানের চোখের কাজ করে।

পৃথিবীতে অ্যাটম বোমা ফাটার খবর তারা রাখে। এই রকম বেশি বোমা ফাটালে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে একথা সে বলল। লোকটি টেলিপ্যাথিতে খুবই ওস্তাদ কারণ আমি আমার মনে মনে যে সব প্রশ্ন ভাবছি, কল্পনা করছি বা ছবি আঁকছি সে সহজেই সব বুঝে নিচ্ছে।

যাই হক তার কাছ থেকে আরও জানলুম যে শুধু ভেনাসের নয় অন্য গ্রহের মানুষরাও এই পৃথিবীতে আসে। তারা নিজেদের নিরাপত্তার জন্যে ভীড় এড়িয়ে নির্জন স্থানে অবতরণ করে নচেৎ মানুষেরা ভয় পেয়ে তাদের মেরে ফেলতে পারে।

মাঝে মাঝে আকাশযান বিকল হয়ে যায়। যাত্রীরা মারাও গেছে। পৃথিবী থেকে ওরা কয়েকজন নরনারীকে ভেনাসে নিয়ে গেছে তবে এ বিষয়ে সে আর কিছু বলতে রাজি হল না।

আমি ক্যামেরা বার করে তার একখানি ছবি তুলতে চাইলুম কিন্তু সে নিষেধ করল। আমিও চাপাচাপি করলুম না। কিন্তু আমি যখন অনুরোধ করলুম তার ছোট সসারটি আমি দেখতে চাই তখন সে

আপত্তি করল না।

আমাকে সঙ্গে করে সে সসারের কাছে নিয়ে গেল। এই সসারটা অনেকটা চ্যাপ্টা ঘণ্টার মতো। ভেতরটা দেখবার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সে রাজি হল না। মাথায় একটা গম্বুজ মতো আছে আর সেটি ঘিরে তারের মতো কিছু জড়ানো রয়েছে। গম্বুজটি অঙ্গারের মতো ঝিক-ঝিক করছিল, ইলেকট্রিক স্পার্কের মতো কিছু বিচ্ছুরিত হচ্ছিল।

সাহস করে একবার বললুম ভেতরে একবার ঢুকতে চাই এবং সম্ভব হলে একটু ঘুরে আসতেও। মৃদু হেসে সে জবাব দিল, আমাকে এখনি ফিরতে হবে, সময় নেই।

কথা শেষ করেই সে সসারের পিছনে গেল কিন্তু কী ভাবে ভেতরে ঢুকল তা আমি দেখতে পাইনি। সসারের সঙ্গে যে গম্বুজ আছে তার ভেতর থেকে মশা মারা ধূপের মতো তিনটি কয়েল বেরিয়ে এল। প্রথম কয়েল দুটি যেদিকে ঘুরতে লাগল তৃতীয়টি ঘুরতে লাগল তার বিপরীত দিকে। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই সসার নড়ে উঠল এবং দেখতে দেখতে আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

সিগারের আকৃতির সেই বিরাট স্পেস শিপ তার জন্যে মহাকাশে কোথাও অপেক্ষা করছে।

যাবার আগে লোকটি আমার কাছ থেকে ফটো তোলবার একটি রোল ফিল্ম চেয়ে নিয়েছিল। ১৯৫২ সালের ১৩ ডিসেম্বর তারিখে ভোরবেলায় যখন আমি যথারীতি আমার দূরবীন নিয়ে আকাশের দিকে তাক করছিলুম তখন আমার বাড়ি থেকে কয়েক শত ফুট দূরে প্রখর দীপ্তি সহযোগে কাচের মতো স্বচ্ছ একটি সসার মাটিতে নেমে এল।

আমি দেখলুম সসারের ভেতর থেকে একটি হাত বেরিয়ে ফিল্মের সেই রোলটি ফেলে দিল। রোলটি ডার্করুমে ডেভেলপ করে দেখা গেল তাতে অবোধ্য ভাষায় কি সব লেখা রয়েছে।

বইখানির উপসংহারে অ্যাডামস্কি তাঁর পাঠকদের আবেদন করে

বলেছেন ঃ আসুন আমরা অন্য গ্রহের মানুষদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করি। তাদের আমরা সাদরে অভ্যর্থনা জানাই। তারা আমাদের মধ্যে যাওয়া আসা সুরু করেছে। তারা আমাদের অনেক কিছু শেখাতে পারে। তাদের সঙ্গে বন্ধুন করলে তারাও আমাদের বন্ধু হবে।

এইখানেই অ্যাডামস্কি তার বিবৃতি শেষ করেছে।

যাই হক অ্যাডামস্কির এই কাহিনীর মধ্যে অবিশ্বাস করবার মতো অনেক তথ্য আছে তবুও বহু লোকই বিশ্বাস করছে। অ্যাডামস্কির কাহিনী কতদূর সত্য বা কতদূর মিথ্যা তা একমাত্র সময়ই প্রমাণ করতে পারবে।

১৯৫৪ সালের ১৪ অকটোবর তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় পরপর কয়েকটি চাঞ্চল্যকর খবর প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলি নীচে তুলে দেওয়া হল—

মঙ্গল গ্রহ হইতে পৃথিবীতে দুইজন সুন্দরী
তরুণীর আবির্ভাব

প্যারিস ১২ই অক্টোবর ফ্রান্সের আকাশে উড়ন্ত পীরিচের আনা-গোনা সম্পর্কে পর পর যত কাহিনী প্রচারিত হইয়াছে, উহার সকলকে অতিক্রম করিয়া অদ্য মঙ্গল গ্রহহইতে পৃথিবীর মৃত্তিকায় দুইটি তরুণীর আবির্ভাব সংবাদ প্রকাশ করা হইয়াছে।

মঁ ঃ মার্টিন নামক জনৈক স্কুল শিক্ষক জানাইয়াছেন যে, ফরাসী অতলান্তিক উপকুল সন্নিকটে ও লোরন দ্বীপে মঙ্গল গ্রহ বাসিনীদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা উভয়েই প্রায় ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি লম্বা। অপূর্ব সুন্দরী এই দুইজন নারী চর্মনির্মিত শিরেস্ত্রাণ, দস্তানা ও বুটজুতা পরিহিত ছিল।

উহারা আমার ফাউন্টেন পেনটি চাহিয়া নিয়া অদ্ভুত ভাষায় কি

যেন লিখিল। উহা বুঝিতে না পারিলেও দলিল হিসাবে উহা আমি সযত্নে রক্ষা করিয়াছি।

গত ২৪ ঘণ্টায় পিরানীজ হইতে আলসেস, আলসেস হইতে ব্রিটানী মোট কথা ফ্রান্সের সর্বত্রই উড়ন্ত পীরিচ, উড়ন্ত বল ও সিগার পরিদৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

উড়ন্ত চাকী বা ফ্লাইং সসার রহস্য

বোম্বাই, ১২ই অক্টোবর—গত ছয় দিনে বোম্বাইয়ের আকাশে দুইবার উড়ন্ত পীরিচ পরিদৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। শ্রী ডি জি যোশী নামক জনৈক ব্যবসায়ী বলেন যে, এই অদ্ভুত পদার্থটি বিপুল গতিতে আকাশের দক্ষিণ হইতে উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটিয়া যায়। উহার গতি ছিল নিঃশব্দ এবং আকাশপথে উহা কোনো চিহ্নও রাখিয়া যায় নাই।

সহরের আরও কতিপয় ব্যক্তি আকাশে উড়ন্ত পীরিচ লক্ষ্য করিয়াছে বলিয়া জানা গেল। মাইকেল জাকব নামক জনৈক কলেজ ছাত্র বলেন যে, গত রাত্রিতে মধ্যরাত্রির কিছুক্ষণ পরে আমি আকাশে উড়ন্ত পীরিচ লক্ষ্য করি। উজ্জ্বল এই পদার্থটি উত্তর আকাশে ছুটিয়া গিয়া মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়।

আলেকজান্দ্রিয়া ও ফ্রাঙ্কফুর্টে উড়ন্ত পীরিচ

প্যারিস, ১১ই অক্টোবর—আলেকজান্দ্রিয়া ও ফ্রাঙ্কফুর্টে উড়ন্ত পীরিচ পরিদৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

আলেকজান্দ্রিয়ার কয়েক শত লোক আকাশে একটি উজ্জ্বল বস্তু দেখিতে পায়। লোহিত বর্ণের এই বস্তুটি ক্রমশঃ কমলা লেবুর বর্ণ ধারণ করে এবং আঁকা-বাঁকা পথে ধীরে ধীরে আকাশের অন্য প্রান্তে চলিয়া যায়।

আলেকজান্দ্রিয়া বিমান ঘাঁটির কর্মচারীরা ব্যাপারটি হেলুয়ান

মান-মন্দিরের গোচরীভূত করেন কিন্তু তাঁহারা দূরবীন তাক্ করিবার পূর্বেই উহা অদৃশ্য হইয়া যায়।

মান-মন্দিরের অধ্যক্ষ বলেন, যাহা দেখা গিয়াছে, তাহা হয় তো আকাশজ্যোতিও হইতে পারে। কেন না, ৪৮ ঘণ্টা যাবত এখানকার আকাশে চুম্বক-ঝটিকা চলিয়াছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের নিকটবর্তী অকষ্টাড বিমান ঘাঁটির আকাশ যে শ্বেতবর্ণ পীরিচটি দৃষ্ট হয়, তাহা নিঃশব্দে আকাশ পথে অগ্রসর হয়।

লেবানন ও ফরাসী কেমেরুন

বেইরুট (লেবানন) ও ইস্থন্দ (ফরাসী কামেরুন) হইতেও উড়ন্ত পীরিচের আবির্ভাব সংবাদ পাওয়া যায়। বেইরুটের সংবাদপত্র 'লা ওরিয়েন্ট' জানান যে, দূরে সমুদ্রতটের আকাশে একটি গতিহীন পদার্থ পরিদৃষ্ট হয়। উহা হইতে শ্বেতবর্ণের আলোকচ্ছটা বিচ্ছুরিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ উহা ভূতলের দিকে নামিয়া আসিতে থাকে কিন্তু হঠাৎ সে গতি স্তব্ধ হয় এবং অকস্মাৎ সোজাসুজি উর্দ্ধে উঠিয়া অদৃশ্য হইয়া যায়। একটি জার্মাণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি এই সংবাদটি জ্ঞাপন করেন।

কিন্তু, অপর এক ব্যক্তি বলেন যে, একটি লোহিত বর্ণের গোলাকার পদার্থ উত্তর দিক হইতে আসিয়া সমুদ্র বক্ষের ৬ শত ফুট উর্দ্ধ পথে অন্য দিকে চলিয়া যায়।

ইস্থন্দে একটি কুকুর সর্বপ্রথমে ঘটনাটি লক্ষ্য করিয়া চিৎকার করিতে থাকে। ইস্থন্দ হাসপাতালের ডাক্তার মেনাস আকাশে একটি উজ্জ্বল পদার্থ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহকর্মিগণকে ডাকিয়া পাঠান।

তাঁহারা সকলে সংবাদপত্র প্রতিনিধির নিকট বলেন পদার্থটি দেখিতে ব্যাঙের ছাতার ন্যায় ছিল। ১৮ শত ফুট উর্দ্ধ আকাশে উড়িয়া যাইবার কালে অকস্মাৎ উহার গতি স্তব্ধ হয়। প্রায় ১৫ সেকেণ্ড নিশ্চল থাকিবার পর উহা পুনরায় উড়িতে থাকে এবং শেষ

পর্যন্ত অদৃশ্য হইয়া যায়।

কামেরুনের আকাশে এই অদ্ভুত পদার্থটি জনস্বাস্থ্য বিভাগের অধ্যক্ষ কর্ণেল কডিন ও নিরাপত্তা বিভাগের অধ্যক্ষ কর্ণেল ড্রামণ্ডও লক্ষ্য করিয়াছেন।—ইউ পি, এ এফ পি।

মাঝে মাঝে আকাশে রহস্যজনক উড়ন্ত সামগ্রী দেখা যায়। সে-গুলি কোথা থেকে আসছে জানা যায় না। খবরের কাগজে তাদের খবর পড়ে জনসাধারণ তাজ্জব বনে যায়। আসর গরম হয়।

কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া গেল ১৯৬৭ সালে।

ক্রিস্টোফার গারনার দিনটা আজও ভোলে নি। হাড়কাঁপানো শীতের শেষ রাত্রের রক্ত হিম করা অভিজ্ঞতা সে কি ভুলতে পারে।

১৯৬৭ সালের অকটোবর মাসের কোনো একটা তারিখ, শেষ রাত্রি, ঘড়িতে তখন চারটে বেজেছে। ইংলণ্ডের একজিটারের কাছে হ্যাদারলে-এর মার্শ উড ফারমের ক্রিস্টোফার গারনার তার ল্যাণ্ড-রোভারে চারদিকের কাঁচ তুলে দিয়ে মোটা একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন।

গাড়ির কাঁচে কে আওয়াজ করল ঠক ঠক ঠক।

গারনার সেই সন্ধ্যা থেকে গাড়ি চালাচ্ছে। ক্লান্ত হয়ে গাড়ি থামিয়ে কিছু খেয়ে নিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। দিনের আলো দেখা দিলেই আবার গাড়ি চালাবে। বাড়ি পৌঁছতে তার এখনও দেরি আছে। এমন সময়ে কে আবার ডাকছে। গারনার বিরক্ত হল।

ভাল করে চোখ খুলতে না খুলতে টর্চের আলোয় তার গাড়ির ভেতরটা আলোকিত হল। ডাকাত নাকি?

না। একজন কনস্টেবল কি যেন বলছে। কাঁচ ভেদ করে তার কথা শোনা যাচ্ছে না।

গারনার দরজা খুলে গাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। বাইরে দু'জন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে আছে। গারনার ভয় পেয়ে গেল। সে কোনো বেআইনী কাজ করেছে নাকি?

বেআইনী কোনো কাজ নয়। কনস্টেবল দু'জন তার সাহায্য-প্রার্থী। তারা তাকে সাক্ষী মানতে চায়।

একজন কনস্টেবল দূর আকাশে হাত দেখিয়ে গারণারকে জিজ্ঞাসা করল:

দেখ তো আকাশে ওটা কি দেখছ?

গারনার দেখল দূরে খানিকটা লালচে আলোর পিণ্ড। সেই লালচে আলোর পিণ্ড হলদে হয়ে গেল এবং আকৃতি বদলে চার-কোনা একটা তারার আকৃতি নিল। এ কি বিচিত্র ব্যাপার! এ কি সে দেখছে? ফায়ারওয়ার্ক? এত দূর আকাশে? অসম্ভব!

গারনার চোখ রগড়ে আবার দেখল। না সে ভুল দেখছে না। স্বপ্নও দেখছে না। তবে যুদ্ধের সময় আকাশে অনেক কিছু দেখেছে। এরকম অদ্ভুত কিছু তো সে দেখে নি।

ওটা কি হতে পারে?

কনস্টেবল দু'জনকে গারনার জিজ্ঞাসা করল।

তারাও কি ছাই জানে ওটা কি? তারা যে নেশা করে আকাশে ভৌতিক কিছু দেখছে না এটা জানাবার জন্যে তারা একজনকে সাক্ষী মেনে রাখল।

কনস্টেবল দুজনের নাম রজার উইলি এবং ক্লিফোর্ড ওয়েক্ট। ওরা ক্রিস্টোফার গারনারের নাম ঠিকানা লিখে নিয়ে চলে গেল।

এরপর সারা গ্রেট ব্রিটেন জুড়ে তুমুল কাণ্ড। উইলি এবং ক্লিফোর্ড তাদের হেডকোয়ার্টারে ঘটনাটি রিপোর্ট করার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের কোনো রিপোর্টার তাজানতে পারে। ফলে প্রেস কনফারেন্স ডাকা হয় এবং খবরের কাগজ মারফত জনসাধারণ এই বিচিত্র ও অবিশ্বাস্য ঘটনা পড়ে চমৎকৃত।

খবরের কাগজে মোটা অক্ষরের তিন-লাইন ব্যানার হেডলাইন। সেই হেডলাইনের বাংলা করলে দাঁড়াবে : ৮০ মাইল গতিতে পুলিস কনস্টেবলরা আকাশে চলন্ত ক্রস অনুসরণ করেছে···উড়ন্ত ক্রস ধরবার চেষ্টায় 'জেড' কার।

উইলি এবং ক্লিফোর্ড প্রেস কনফারেন্সে বলল :

রাত্রিবেলায় ওকহ্যামটন এবং হলওয়ার্দির মধ্যে তারা তাদের জিপে চেপে যখন ডিউটি দিচ্ছিল তখন আকাশে তারা একটি অদ্ভুত বস্তু দেখতে পায়। সেই বস্তু যেন তাদের জিপকে অনুসরণ করছিল।

তীব্র না হলেও উজ্জ্বল আলো সেই বস্তু বা যান থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। উইলি এবং ক্লিফোর্ড যা দেখেছে স্পষ্টই দেখেছে। তাদের দৃষ্টিবিভ্রম হয় নি।

সেই উজ্জ্বল বস্তুটি তাদের বাঁ দিক দিয়ে আগে আগে গাছের মাথা দিয়ে যাচ্ছিল। কোনো আওয়াজ শোনা যায় নি।

বার্তা প্রেরণের জন্যে তাদের জিপে অয়ারলেস ট্রান্সমিটার ছিল। ব্যাপারটা তারা হেডকোয়ার্টারে জানিয়ে দিয়ে বলল যে ঐ অজানিত যানটিকে তারা অনুসরণ করছে। জিনিসটা কি দেখা দরকার।

৯০ মাইল পর্যন্ত স্পিড বাড়িয়েও তারা সেই অজানিত যানের কাছে যেতে পারল না। তারা জিপের গতি বাড়ালেও সেই যানও গতি বাড়ায় এবং দূরত্ব অপরিবর্তিত রাখে। সমান দূরত্ব বজায় রেখে সে উড়ে চলে।

কতভাবে ওরা চেষ্টা করল কাছে যাবার কিন্তু গোড়া থেকে সেই যে চারশ গজ দূরত্ব বজায় রেখে সেই রহস্যজনক যান উড়ে চলেছে তার আর হ্রাস বৃদ্ধি হল না।

ইতিমধ্যে কনস্টেবল দু'জন পথের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাণ্ড রোভারে নিদ্রিত গারনারকে তুলে আকাশের সেই বস্তুটিকে দেখিয়েছে। বস্তুটি আকাশে অদৃশ্য হয়ে যাবার আগে আরও একটি উজ্জ্বল বস্তু এসে প্রথমটির সঙ্গে মিলিত হয় তারপর তারা দূরে চলে

যেতে যেতে নক্ষত্রদের মধ্যে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল।

নিকটবর্তী সিভেনার রয়েল এয়ার ফোর্স স্টেশনে খোঁজ নেওয়া হল। তারা বলল এ বিষয়ে তারা কিছু জানে না। আর এ এফ এরকম কোনো বিমান তৈরি করেছে বলেও তারা জানে না। এই ধরনের কোনো বিমানের অস্তিত্বও তাদের জানা নেই।

এমন কোনো বিমানের খবর তাদের জানা নেই যে তার স্পিড ঘণ্টায় পঞ্চাশ মাইল পর্যন্ত কমিয়ে এনে আবার শব্দের গতিবেগ অতিক্রম করতে পারে।

খবরের কাগজে এই সংবাদ পড়ে সকলে স্তম্ভিত।

খবরের কাগজে অজানা আকাশ-যানের খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুজবে দেশ ভরে উঠল। ইংলণ্ডের যত্রতত্র নাকি নানা আকারে উড়ন্ত যান দেখা যাচ্ছে।

তবে সবই গুজব নয়। কয়েক ক্ষেত্রে সত্যও আছে।

১৯৩৫ সাল নাগাদ সময়ে আমাদের এই বঙ্গদেশ জলপাইগুড়িতে নাকি মহাভারতের অশ্বত্থামাকে দেখা গিয়েছিল।

দীর্ঘাকৃতি এক ব্যক্তিকে নাকি বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে যেতে দেখা গিয়েছিল। তারপর অশ্বত্থামাকে দেখা না গেলেও তার পায়ের ছাপ বঙ্গ দেশের সর্বত্র নাকি দেখা যেতে লাগল। এমন কি সেই পায়ের ছাপ কাগজে ছেপে দু'পয়সা দামে বিক্রি হতে লাগল।

পরে অশ্বত্থামাকে আর দেখা যায় নি পায়ের ছাপও আর কোথাও পড়েনি। গুজবের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল।

বর্তমান ক্ষেত্রে তা হয় নি। অধিকাংশ গুজব হলেও কিছু নির্ভর-যোগ্য ব্যক্তির উক্তি উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

ডার্বিশায়ারের গ্লস্প পল্লীতে ছ জন পুলিস অফিসার দূর আকাশে একটি জ্বলন্ত ক্রস দেখতে পেয়েছিল। অনুরূপ জ্বলন্ত ক্রস দেখেছিল ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশনের কয়েকজন এঞ্জিনিয়ার যখন তারা ডার্টমুরে একটি ট্রান্সমিটার বসাচ্ছিল।

ব্রাইটনের একজন বাস ড্রাইভার সাসেক্স জেলার সল্টডিনের সমুদ্রতীর বরাবর রাস্তা ধরে যখন যাচ্ছিল তখন আর একটু হলেই সে অ্যাকসিডেন্ট বাধিয়ে বসত।

তার মনে হল সে যেন দেখল আকাশে বিরাট একটা সিগার। উইণ্ডস্ক্রীনে কোনো পোকা পড়েছে নাকি? সেইটে বড় দেখাচ্ছে? উইণ্ডস্ক্রীনটা মুছল। না। উইণ্ডস্ক্রীনে কিছুই নেই। ও তো আকাশে। চোখের ভুল নয়। বিরাট একটা সিগার আকাশে ভেসে চলেছে। আর সেই বিরাট সিগারের এক প্রান্ত থেকে সবুজ আলোর আভা আর মাঝে মাঝে বিচ্ছুরিত হচ্ছে আলোর স্ফুলিঙ্গ।

স্কটল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরের একজন কোস্টগার্ড আকাশে চকচকে রূপালি একটি চাকা দেখেছিল। চাকাটি ছিল গোরুর গাড়ির চাকার মতো।

রয়েল এয়ারফোর্সের অবসরপ্রাপ্ত উইং কমাণ্ডার এরিক কক্স নিজের গাড়ি নিজেই ড্রাইভ করে চলেছেন। পাশে বসে আছেন তাঁর স্ত্রী। ওরা যাচ্ছেন হ্যামশায়ারে ক্যাডনাম থেকে ফোর্ডিংব্রিজ। সন্ধ্যা পার হয়ে অন্ধকার নেমে এসেছে। আকাশ পরিষ্কার।

সেই পরিষ্কার আকাশে ওরা দুজনেই সাতটা আলোক পিণ্ড দেখতে পেলেন। প্রতিটি উজ্জ্বল এবং ইংরেজী অক্ষব 'ভি'-এর ফর্মেশনে উড়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পরে 'ভি' ফর্মেশন বদলে একটি ক্রস চিহ্নর আকারে উড়ে চলল। কোনো আওয়াজ নেই। গতি প্রচণ্ড।

এরিক কক্স বলেন: আকাশ পরিষ্কার ছিল। সবে চাঁদ উঠছে। আমাদের দেখার কোনো ভুল হয় নি, মাথাও পরিষ্কার ছিল। যেভাবে সেই সাতটি আলোকপিণ্ড উড়ে চলেছিল তাতে বেশ বোঝা যাচ্ছিল তাদের কেউ নেতা আছে। যার আদেশ তারা পালন করছে।

সাসেকসের রয়েল অবজারভেটরির অ্যাস্ট্রনমাররা ব্যাপারটা

উড়িয়ে দিতে চাইলেন। তারা বললেন বছরের এই সময়ে পুব আকাশে ভেনাস গ্রহ খুব উজ্জ্বল দেখায়। আকাশে যারা জ্বলন্ত ক্রশ দেখেছে তারা ঐ ভেনাসকেই দেখেছে।

ইস্ট সাসেকসের চিফ কনস্টেবল জর্জ টেরি বললেন যে তাঁর কনস্টেবলরা আকাশে যা দেখেছে তা ভুল দেখেছে। তারা দেখেছে কৃত্রিম উপগ্রহ। ঐ উপগ্রহ থেকে চাঁদের আলো প্রতিফলিত হয়ে তাদের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েছে।

কিন্তু তাদের যুক্তি বেশি দিন টিকল না।

সাসেকসের রয়েল অবজারভেটরির কর্তৃপক্ষ হেস্টিংসের অ্যামেচার অ্যাস্ট্রনমার পিটার বেকারকে বললেন যে আজকাল এই যে সব জ্বলন্ত তারকা বা ফ্লাইং ক্রশ সম্বন্ধে গুজব শোনা যাচ্ছে তুমি তার ওপর নজর রাখ, ব্যাপারটা কি তলিয়ে দেখ, ভেনাসের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক আছে কি না সেটাও দেখ।

বেশ কিছুদিন নজর রাখার পর পিটার বেকার একদিন ঘোষণা করলেন যে মেঘস্তরের নীচে তিনি একটি অজানা উড়ন্ত বস্তু অর্থাৎ আন-আইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট বা ইউ এফ-ও দেখেছেন যার সঙ্গে ভেনাসের কোনো সম্পর্ক নেই। খালি চোখে দেখেন নি। তিনি যা দেখেছেন তা তাঁর শক্তিশালী দূরবীন দিয়েই দেখেছেন।

সাসেকসের রয়েল অবজারভেটরি পিটার বেকারের কথা বিশ্বাস করলেন এবং তাঁরাও ঘোষণা করলেন যে বায়ুমণ্ডলে এমন কিছু ঘুরে বেড়ায় যা নক্ষত্র নয়, গ্রহও নয়।

মানুষের দৃষ্টিবিভ্রমও হয় বৈকি। অনেক সময় মানুষ ভুল দেখে কিন্তু সব ক্ষেত্রে নয়। আবার আকাশে মানুষই এমন সব ব্যাপারের জন্যে দায়ী যা অনেকের জানা না থাকায় গুজবের সৃষ্টি হয়।

যেমন রাত্রে যখন উড়ন্ত অয়েল ট্যাংকার থেকে কোনো বিমানে তেল ভর্তি করা হয় তখন ঐ ট্যাংকারের নীচে সাতটি বা আটটি উজ্জ্বল আলো জ্বলে। যাদের এ ব্যাপার জানা নেই তারা আকাশে

ঐ রকম সারিবদ্ধ আলো দেখলে অনেক কিছু কল্পনা করতে পারে।

এই সময় ইংলণ্ডে ইউ এস এয়ারফোর্সের বেশ কিছু বিমান ছিল। তারা আকাশে মহড়া দিত যার মধ্যে আকাশে অয়েল ট্যাংকার থেকে বিমানে তেল ভর্তি করা মহড়ার অন্যতম অঙ্গও ছিল।

তবে তেল ভর্তির একটা নির্ধারিত সময় ছিল। বিকেলে ৫টা থেকে রাত্রি ৯টার মধ্যেই অয়েল ট্যাংকারের মহড়া চলত। তারপর আর নয়।

কিন্তু একদিন রাত্রি ৯ টার অনেক পরে রেভারেণ্ড লরেন্স ইঞ্জে নামে একজন পাদ্রী সাহেব দূর আকাশে দেখলেন একটি উজ্জ্বল আলোকে ঘিরে সাতটি ছোট আলো একটি সীসার মধ্যে যেন চক্র দিচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল তখন কোনো উড়ন্ত অয়েল ট্যাংকার কোনো বিমানে তেল যোগান দিচ্ছিল না। পাদ্রী সাহেবের কথা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

পুলিস অফিসারেরা বিশেষ করে সাসেকসের পুলিস রাত্রের আকাশে আরও জ্বলন্ত ক্রস এবং বিরাট সিগার দেখতে গেল। সব সিগার সম্ভবতঃ এক নয়। কোনো কোনোটিতে জানালার মতো কিছু দেখা যায়। সিগারগুলির প্রান্ত থেকে যে আলো বা রশ্মি বিচ্ছুরিত হয় তার রং সর্বদা একরকম নয়।

গভীর রাত্রে পুলিসম্যানরাই রাস্তায় ডিউটি দেয় সেইজন্যে এই-সব ইউ-এফ-ও তাদের নজরে পড়া স্বাভাবিক।

একজন পুলিসম্যান রিপোর্ট করছে যে সে তার শর্ট ওয়েভ রেডিওতে মৃদু বিস্ফোরণের একটা আওয়াজ পায়। আকাশে বিদ্যুৎ চমকালে রেডিওতে যেরকম আওয়াজ শোনা যায়। আকাশ তখন মেঘমুক্ত তাই সে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে যে একটি বিরাট সিগার ভেসে চলেছে। সিগারটি কোনো ধাতুর তৈরি বলে মনে হল। গায়ে যেন পোর্টহোল রয়েছে। জোনাকির মতো আলো

দেখা যাচ্ছে এবং একটা মৃদু আওয়াজও শোনা গেল। লম্বায় সেটি ৫০ ফুট হবে এবং তার ব্যাস ১০ ফুট মতো হবে।

এ সবই হল ১৯৬৭ সালের ঘটনা। ঐ বছরে গ্রেট ব্রিটেনের আকাশে ৩৬২টি ক্ষেত্রে ইউ-এফ-ও অর্থাৎ অজানা উড়ন্ত বস্তু দেখা গিয়েছিল কিন্তু পূর্ব বৎসরে মাত্র ৯৫টি ক্ষেত্রে। ১৯৫৯ সালে মাত্র ২২টি ক্ষেত্রে ইউ-এফ-ও দেখা গিয়েছিল।

১৯৬৭ সালের অকটোবর মাসে যে সব ইউ-এফ-ও দেখা গিয়েছিল তা নিয়ে বিলেতের পার্লামেণ্টে হাউস অফ কমনসে প্রশ্ন উঠেছিল।

প্রতিরক্ষা বিভাগের আণ্ডার সেক্রেটারি মিঃ মারলিন রীস উত্তরে বলেছিলেন যে কতকগুলি আলো দেখা গিয়েছিল যেগুলি বিভিন্ন ধরনের বিমানের আলো। কতক ক্ষেত্রে ভেনাস দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েছিল কিন্তু অনেকগুলি আলোর উৎস বা উড়ন্ত বস্তু সনাক্ত করা যায় নি।

তিনি আরও বলেন যে এই সকল অজানা বস্তু ক্ষতিকারক নয়, সেরকম কোনো রিপোর্টও পাওয়া যায় নি। রয়েল এয়ার ফোর্সকে স্থায়ী নির্দেশ দেওয়া আছে যে আকাশে কোনো অজানা বস্তু দেখলে তারা যেন রিপোর্ট করে এবং ব্যাপারটা তারা অনুসন্ধান করে দেখে।

এইগুলি মঙ্গল বা অন্য কোনো গ্রহ থেকে প্রেরিত হচ্ছে, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

ইউ-এফ-ও-এর ঘটনাগুলি অধিকাংশই ঘটছে সাসেকসের আকাশে। কারণটা যে কি তা কেউ বলতে পারছে না কিন্তু ঘটছে।

সাসেকসের একটা ট্রান্সপোর্ট বিজনেসের অর্থাৎ পরিবহন সংস্থার কর্তা বি জে কলেট এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা লাভ করলেন। এমন ঘটনা আটলান্টিক মহাসাগরের সেই রহস্যময় এলাকা বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলে ঘটেছে।

কলেট একদিন একটা ফোর্ড ট্রানজিট বাস চালিয়ে তাঁর বাড়ি থেকে বার্মিংহামের কাছে রেডডিচ গ্রামে যাচ্ছেন।

ভোর তখন সাড়ে চারটে। কলেট তখন রেডিং শহরের কাছাকাছি। আকাশে চাঁদ, পরিষ্কার আকাশ, মেঘ নেই, কুয়াশা নেই। কলেট তার গাড়ির রেডিওতে স্পেনিশ সঙ্গীত শুনতে শুনতে মনের আনন্দে চলেছেন।

হঠাৎ রেডিওর আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গেল, হেডলাইট নিবে গেল, গাড়ির এঞ্জিনও বন্ধ হয়ে গেল। কলেট তাজ্জব। সে গাড়ির ব্রেক কসে গাড়ি থেকে নেমে পড়ল তারপর বনেট তুলে এঞ্জিন ব্যাটারি ইত্যাদি সব একে একে পরীক্ষা করতে লাগল, এমন কি ফিউজ প্লাগ, ডিস্ট্রিবিউটর, সব কিছু কিন্তু কোথাও কোনো দোষ পাওয়া গেল না। সবই তো ঠিক আছে তবে গাড়ি চলছে না কেন? কলেট বোকা বনে গেল।

কলেট গাড়িতে উঠে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করতে লাগল। বৃথা। কিন্তু দূরে রাস্তার মাথায় ছায়া ছায়া মতো ওটা কি? কলেট সেদিকে মাঝে মাঝে দেখছে, এদিকে এঞ্জিন চালাবার চেষ্টাও করছে। গাড়ি নড়বার কোনো লক্ষণ নেই।

চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে কলেট সিটে হেলান দিয়ে কয়েক মিনিট চুপ করে বসে রইল। তারপর কি মনে করে হঠাৎ সে যেই ইগনিশন কি ঘুরিয়েছে আর অমনি গাড়িতে স্টার্ট হয়ে গেল, হেডলাইট জ্বলে উঠল, রেডিও বাজতে লাগল। ভৌতিক কাণ্ড নাকি?

কলেট গাড়ি চালাতে আরম্ভ করল কিন্তু ৪০০ গজ আন্দাজ রাস্তা অতিক্রম করে গাড়ি আবার অচল হয়ে পড়ল। কলেট গাড়ি

থেকে নেমে আবার সব কিছু পরীক্ষা করতে লাগল।

ইলেকট্রিক তারে আগুন লাগলে যেমন একটা গন্ধ পাওয়া যায়, কলেটের নাকে যেন সেইরকম একটা গন্ধ ধাক্কা দিতে লাগল। গন্ধ কিন্তু তার গাড়ি থেকে আসছে না।

কলেট মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গন্ধের উৎস সন্ধানে ঘ্রাণ নিতে লাগল। হঠাৎ তার নজরে পড়ল শতখানেক গজ দূরে ছায়া ছায়া সেই বস্তুটা।

ওটা কি? ওটা যাই হক ওটার জন্যেই যে তার গাড়ি অচল হচ্ছে এমন চিন্তা কলেটের মাথায় একবারও আসে নি।

ওটা কী? মালভর্তি ত্রিপল ঢাকা কোনো ট্রাক? বোঝা যাচ্ছে না। তবে জিনিসটার আকারের একটা ধারনা করা যায়। না। ওটা ট্রাক তো নয়! ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ট্রাকের চেয়ে বড়। এখন তো মনে হচ্ছে গোল ও চ্যাপ্টা কোনো বস্তু। ৬০ ফুট বাই ৩০ ফুট হবে বোধহয়।

কলেট সেই বস্তুটার দিকে চেয়ে রইল। তার অবাক লাগছে। কিন্তু জিনিসটা নড়তে লাগল তারপর আকাশ কিছু উঁচুতে উঠে গাছের আড়ালে কোথায় অদৃশ্য হল।

কলেট স্পষ্ট একটা কিছু দেখেছে। চোখের ভুল নয়। কিন্তু সে কি দেখল, জিনিসটা কি? তা সে বলতে পারে না।

ভাবতে ভাবতে নিজের গাড়িতে উঠে এসে এঞ্জিনে স্টার্ট দিতেই এঞ্জিন গর্‌র্‌র্ করে উঠল। অদ্ভুত ব্যাপার তো।

কলেট তার এই অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতার কথা কাউকে বলে নি। কেউ তো সাক্ষী নেই। তার কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। মিছি মিছি নিজেকে কেন হাস্যাস্পদ করে।

কিন্তু এটা তো ঠিক যে সে একটা কিছু দেখেছে এবং সেটা যতক্ষণ জমির ওপরে ছিল ততক্ষণ তার গাড়ি চলে নি। ব্যাপারটা সে মন থেকে তাড়াতে পারছে না।

একটা পত্রিকা তার চোখে পড়ল। নাম ফ্লাইং সসার রিভিউ, সম্পাদকের নাম চার্লস বাওএন। বাওএনের সঙ্গে কলেট দেখা করল। বাওএন তো সব শুনে লাফিয়ে উঠল। সে এইরকম এক জন সাক্ষী খুঁজছিল।

ফ্লাইং সসার সম্বন্ধে তদন্ত তল্লাস করছেন এমন একজন ব্যক্তির সঙ্গে কলেটের তিনি দেখা করিয়ে দিলেন। সেই ব্যক্তির নাম ডঃ বার্নার্ড ফিঞ্চ। দেখা করার সময় আরও একজন হাজির ছিল, তার নাম আর এইচ বি ওআইনডার।

ডঃ ফিঞ্চ পনেরো বছর ধরে ফ্লাইং সসার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছেন। কলেটকে তিনি সহজে ছাড়লেন না। খুঁটিয়ে জেরা করতে লাগলেন। তবে তিনি কলেটের একটি কথাও অবিশ্বাস করেন নি।

সেই অদ্ভুত বস্তুটি যতক্ষণ-জমির ওপর ছিল ততক্ষণ কলেট একটা শারীরিক অসুবিধা ভোগ করেছিল। ঘটনার সময় কলেট তা বুঝতে পারে নি কিন্তু ডঃ ফিঞ্চ জিজ্ঞাসা করায় এখন তার সে কথা মনে পড়ল। কান ঝিঁ ঝিঁ করছিল, মানসিক একটা উৎকণ্ঠাও কলেট অনুভব করছিল। তখন তার মনে হয়েছিল যে তার গাড়ি হঠাৎ বন্ধ হওয়ার ফলে তার এই দৈহিক অসুবিধা হচ্ছে। হয় তো ব্লাড প্রেসার বেড়ে গিয়েছে।

ডঃ ফিঞ্চ বললেন যে ফ্লাইং সসার যতক্ষণ জমির ওপর থাকে ততক্ষণ তার চারপাশে বাতাসের অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি হয় যার ফলে এই দৈহিক অসুবিধাগুলি দেখা যায়।

কলেটের মনে পড়ল যে সে আবার যখন গাড়ি চালাতে আরম্ভ করেছিল তখন তার মনে হয়েছিল যে তার হাত পা আড়ষ্ট হয়ে গেছে। এই আড়ষ্টতা কাটিয়ে উঠতে তার বেশ সময় লেগেছিল।

ডঃ ফিঞ্চ বললেন ঃ এই রকমই হয়। ফ্লাইং সসারের কাছাকাছি এসেছে এমন ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি শুনেছেন যে তাদেরও এইরকম অবস্থা হয়েছিল। ফ্লাইং সসারের উপস্থিতি মানুষের

স্নায়ুগুলি অনড় করে দেয়, হাত পা যেন অবশ হয়ে যায়। শরীরের ভেতরে কে সুড়সুড়ি দেয়। অনেকের হাত পায়ে ঝিঁ ঝিঁ ধরে গেছে, এমনও শোনা গেছে। ফ্লাইং সসার স্থান ত্যাগ না করা পর্যন্ত শারীরিক এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে সময় লাগে।

১৯৪৬ সাল থেকেই ফ্লাইং সসারের কথা শোনা যাচ্ছে। ঐ বছরে একখানি বই প্রকাশিত হয়েছিল, নাম স্ট্রেঞ্জ সাইনস ফ্রম হেভেন। তখন আকাশে মাঝে মাঝে উড়ন্ত চাকি দেখা যেত। সেগুলি চোখে দেখলেও জনসাধারণ সেগুলিকে অপার্থিব মনে করত না।

জনসাধারণ ভাবত যে মহাযুদ্ধের সময় নানারকম বিমান আবিভূ ত হয়েছে। এইগুলিও নতুন ধরনের কোনো বিমান। হয় এগুলি মহাযুদ্ধের সময় ব্যবহার করার দরকার হয় নি কিংবা তখনও নির্মাণ সম্পূর্ণ হয় নি। এখন নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়েছে তাই এগুলি আকাশে উড়িয়ে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

পরের বছর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ২৪ জুন তারিখে মার্কিন ব্যবসায়ী কেনেথ আরনল্ড ইডাহো থেকে ওয়াশিংটন যাবার পথে নিজের বিমান থেকে এক ঝাঁক ফ্লাইং সসার দেখতে পান।

ফ্লাইং সসার নামটা তখন থেকেই চালু হয় এবং আরও সসার দেখা যেতে থাকে। এ কথা এই বইয়ের আরম্ভে বলা হয়েছে। জন-সাধারণ ফ্লাইং সসার সম্বন্ধে ধীরে ধীরে সচেতন হতে থাকে। অনেকে অনুমান করতে থাকেন যে এগুলি অন্য কোনো গ্রহ থেকে আসছে। সেই গ্রহের জীব এগুলি চালায়। খবরের কাগজে শিরনাম ছাপা হতে থাকে: অন্য গ্রহবাসীরা কি পৃথিবীর ওপর নজর রাখছে? ব্যঙ্গচিত্রকররা ছবি আঁকতে থাকেন। ঠাট্টা বলে অনেকে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলেন।

কিন্তু ১৯৪৮ সালের ৭ জানুয়ারি তারিখে সেই শোচনীয় ঘটনা ঘটল। অ্যামেরিকায় ফোর্ট নক্স সুপরিচিত মিলিটারি ঘাঁটি।

সেখানকার গডম্যান ফিল্ডের ওপর একটি ইউ-এফ-ও দেখা গেল।

আকাশ পরিষ্কার। রোদ উঠেছে। অনেকগুলি মিলিটারি বিমান মহড়া দিচ্ছে। হঠাৎ ফোর্ট নক্সের কন্ট্রোল টাওয়ারে টেলিফোন ও বেতারবার্তা আসতে আরম্ভ করল। আকাশে নাকি অদ্ভুত কিছু দেখা যাচ্ছে।

ফোর্ট নক্সের কয়েকজন লোক বাইরে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে চেয়ে দেখল দূর আকাশে কুলফি বরফের মতো কি একটা ভাসছে, মাথাটা লাল!

ব্যাপারটা কি? দেখবার জন্যে তখনি ন্যাশনাল গার্ডের চারখানা পি-৫১ বিমান পাঠান হল। চারখানা বিমানের মধ্যে একখানা বিমানে ছিলেন ক্যাপটেন টমাস ম্যানটেল। এঁর কথাও আগে বলা হয়েছে।

কন্ট্রোল টাওয়ারকে উত্তেজিত কণ্ঠে ম্যানটেল জানালেন, হ্যাঁ, জিনিসটা আমি দেখতে পেয়েছি, বিরাট আকাশ, কোনো ধাতুর তৈরি বোধ হয়, অনেক উঁচুতে···

বাকি তিনখানা প্লেনের পাইলট কিছু জানায় নি। তারা নাকি কিছু দেখতে পায় নি।

ক্যাপটেন ম্যানটেল আবার জানালেন যে জিনিসটা দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে, আমি কিন্তু ছাড়ছি না। কুড়ি হাজার ফুট পর্যন্ত ওপরে উঠে দেখব, তখনও যদি কাছাকাছি পৌঁছতে না পারি তাহলে নেমে আসব···

এরপর ক্যাপটেন ম্যানটেল নীরব। আর কোনো বার্তা তিনি পাঠান নি। গ্রাউণ্ড কন্ট্রোল তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল।

কয়েক মাইল দূরে পাওয়া গেল তার ভাঙা প্লেন ও তাঁর মৃতদেহ। ইতিমধ্যে সেই 'কুলফি' অদৃশ্য হয়েছে। দুর্ঘটনা কি ভাবে ঘটল কিছু জানা গেল না।

বিমানের ভগ্নাংশ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করেও কিছু পাওয়া গেল না।

ইউ-এফ-ও-তে যারা বিশ্বাস করেন তাঁরা বললেন যে ম্যানটেল সম্ভবতঃ সেই 'কুলফির' খুব কাছে গিয়েছিল যা কুলফির আরোহীরা পছন্দ করে নি এবং যেভাবে হক তারাই প্লেনখানা ফেলে দিয়েছে।

অপর দল বলল যে ম্যানটেল সীমানা অতিক্রম করে বেশি উঁচুতে উঠেছিল। সেখানে অকসিজেনের অভাবে ম্যানটেলের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। চোখে অন্ধকার দেখেছিল। যাকে বলে ব্ল্যাক-আউট, ফলে প্লেন ক্র্যাশ।

দূর আকাশে কুলফি আকারের সেই ইউ-এফ-ও? কসমিক রশ্মি পরীক্ষার জন্যে ওটা একটা বেলুন হতে পারে কিংবা মেঘে জমা তুষার কণার ওপর সূর্যের আলো পড়ে দৃষ্টি বিভ্রম ঘটিয়েছিল এমনও তো হতে পারে।

সবই অনুমান। কসমিক রশ্মি পরীক্ষার জন্যে যারা বেলুন ছাড়েন তারা বললেন যে অনেক বেলুনই তো ছাড়া হয়। সব বেলুন ফেরত পাওয়া যায় না তবে সেই সন্দেহজনক বেলুনটি তাঁদের কি না তা তাঁরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারলেন না।

কুড়ি বছর পরে এই রকম বিরাট আর একটি 'কুলফি' দেখা গিয়েছিল তবে এবার ব্রিটেনের আকাশের ওপর। ইংলণ্ডের ডেভন-শায়ারে ব্রিক্সহ্যামের আকাশে পনেরো হাজার ফুট ওপরে কুলফিটি দেখতে পেয়ে অনেকেই থানায় টেলিফোন করল।

শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে কোস্টগার্ডরাও বস্তুটি দেখল। একজন বলল যে কুলফির গায়ে একটা দরজা দেখা গিয়েছে। আর একজন বলল যে একটা প্লেন কুলফিটাকে প্রদক্ষিণ করছিল। কাদের প্লেন? কি রকম প্লেন? জানা যায় নি।

কিছুক্ষণ পরেই সেই বিরাট কুলফি মেঘের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যায়। বিমানখান্না সম্বন্ধে পরে খোঁজ করা হয়েছিল কিন্তু স্পষ্ট কোনো রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা বিভাগ একটা প্রেসনোট প্রকাশ করেছিল। তারা এ বিষয়ে খোঁজ খবর করেছিল। প্রেসনোটে তারা বলেছিল যে এটা সম্ভবতঃ মোটরগাড়ির হেড-লাইটের প্রতিফলন থেকে সৃষ্ট ধাঁধাঁ কিংবা বায়ুমণ্ডলে জল, বাতাস ও মেঘ দ্বারা গঠিত অস্থায়ী কোনো ব্যাপার।

প্রেসনোট পড়ে মনে হয়েছিল তারা কিছু চেপে যাচ্ছে। ভাষা মোটেই স্পষ্ট ছিল না।

রয়েল এয়ারফোর্সের একজন সিনিয়র কণ্ট্রোলার প্লিমাথে ছিলেন। খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সহজে ছাড়বার পাত্র নয়! তারা সেই আর এ এফ অফিসারকে চেপে ধরল। ব্যাপারটা কি খোলসা করে বলুন মশাই, আপনারা সত্যিই কিছু অপার্থিব দেখে ছিলেন নাকি ওটা আপনাদের নতুন কোনো স্পেসক্র্যাফট।

মনে হল সেই সিনিয়র অফিসারও পুরো ব্যাপারটা জানেন না বা জানলেও তাঁর বলতে বাধা আছে। তিনি শুধু এইটুকু বললেন যে. আমরা যা জানি তা তো প্রকাশ করেছি কিন্তু সেই এয়ারক্র্যাফট কোথা থেকে এসেছিল, পৃথিবীর কোনো অজ্ঞাত স্থান থেকে অথবা পৃথিবীর বাইরে থেকে, তা আমি জানি না তবে খোঁজ নেওয়ার জন্যে একটা বিমান পাঠানো হয়েছিল এ তো অনেকেই দেখেছে। আমি শুধু এইটুকু জানি যে ঐ ইউ-এফ-ও আমাদের রাডার স্ক্রীনে ধরা পড়েছিল।

ব্রিক্সহ্যামের কাছে ব্যারিহেড। সেখানকার কোস্টগার্ড-এর চিফ অফিসার হ্যারি জনসন বললেন: ব্যাপারটা ঘটেছিল দিনের বেলায় অতএব মোটরগাড়ির হেডলাইটের প্রতিফলন নয়। দিনের বেলায় কে মোটরগাড়ির হেডলাইট জ্বালবে আর জ্বাললেও দিনের আলোয়? আকাশে বা মেঘে তার প্রতিফলন কি করে পড়তে পারে

তখন মধ্যাহ্ন। জিনিসটা আকাশে স্পষ্টই দেখা গিয়েছিল। জিনিসটা কোনো ধাতুর তৈরি এবং গায়ে রোদ পড়ে বেশ চকচক করছিল।

কোস্টগার্ড ব্রায়ান জনসন বলল যে সে ঐ অজ্ঞাত আকাশযানের একটি ছবি এঁকেছে এবং ছবিখানা একজন এয়ার ভাইস-মার্শালকে দেখিয়েছিল। তিনি ছবি দেখে মন্তব্য করেছিলেন 'মোস্ট ইন্টারেষ্টিং।'

ব্রিক্‌সহ্যামের ওপরে আকাশে সেই রহস্যজনক বস্তুটির কোনো ফটোগ্রাফ প্রকাশিত হয় নি। পনেরো থেকে কুড়ি হাজার ফুট ওপরে চলন্ত সেই বস্তুটির কোনো ফটো নেওয়া সম্ভব হয় নি বোধহয়।

কোনো সূত্র থেকেই কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাওয়া যায় নি। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা দফতর সম্ভবতঃ আরও কিছু জানেন কিন্তু কোনো কারণে সম্পূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশ করছেন না।

আমেরিকাতেও টমাস ম্যানটেলের মৃত্যু তথা বিমানধ্বংস ব্যাপারটাও যেন চাপা দেওয়া হল। কারণ কি? একমাত্র মিলিটারি কর্তৃপক্ষই বলতে পারেন।

ফ্লাইং সসার রহস্য ক্রমশঃ ঘনিয়ে উঠছে। ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে রহস্যজনক কিন্তু কেনো সূত্র থেকে কোনো সন্তোষজনক কৈফিয়ত পাওয়া যাচ্ছে না।

কোথায় কবে কখন যে ফ্লাইং সসার দেখা যাবে তা কেউ বলতে পারে না আর দেখা গেলেও ওরা আকাশে বেশিক্ষণ থাকে না। এত উঁচুতে থাকে যে ভাল ফটোগ্রাফও তোলা যায় না। কেউ কেউ ফটো তুলেছে কিন্তু তা থেকে কিছু অনুমান করা গেলেও ফটো খুব স্পষ্ট নয়।

ফ্লাইং সসার কোথায় দেখা দেবে জানতে পারলে না হয় শক্তিশালী

টেলিফটো লেনসযুক্ত ক্যামেরা নিয়ে প্রস্তুত থাকা যায় কিন্তু তা আজও সম্ভব হয় নি।

১৯৬৫ সালের কথা। আয়ারল্যাণ্ড। বকসিং ডে।

দুজন মহিলা ওয়াটারফোর্ড কাউন্টিতে ক্যাপোকুইনের কাছে তখন মোটর চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বেলা তখন সওয়া তিনটে থেকে সাড়ে তিনটের মধ্যে। নীল আকাশ, মেঘ নেই।

মহিলা দুজনের একজনের নাম মিস জ্যাকলিন উইংফিল্ড। ইনি হলেন প্রথম লর্ড জেলিকোর নাতনি। অপর মহিলা তাঁর বান্ধবী, মিস মরটেনসেন। ডেনমার্কের কন্যা। দুজনেই রীতিমতো শিক্ষিত ও বুদ্ধিমতী।

গাড়ি চালাচ্ছিলেন মিস উইংফিল্ড।

ওটা কি? ওটা কি? বলতে বলতে সামনে আকাশের দিকে আঙ্গুল দেখালেন মিস মরটেনসেন। চ্যাপটা ও গোলাকার একটা বস্তু ডান দিক থেকে বাঁ দিকে নিঃশব্দে উড়ে যাচ্ছে যার এক প্রান্ত থেকে নির্গত হচ্ছে ধোঁয়াহীন অগ্নিশিক্ষা।

দুজনে বিস্ময়ে হতবাক। মিস উইংফিল্ড গাড়ির ব্রেক কসলেন। বিস্মিত হলেও দুজনে উপস্থিত বুদ্ধি হারাননি। দুজনের সঙ্গেই ক্যামেরা ছিল। মিস মরটেনসেনই প্রথমে তাঁব ক্যামেরা বার করে চট করে একটা স্ন্যাপ নিতে পেরেছিলেন। মিস উইংফিল্ড তাঁর ক্যামেবা বাব করবার আগেই বস্তুটি তাঁদের দৃষ্টির বাইরে চলে যায়।

বস্তুটি যে কি তা তাঁরা বলতে পারেন নি তবে ওটি প্রচলিত কোনো এয়ারক্র্যাফট নয় কিন্তু এটা ঠিক যে তারা স্পষ্টই সেটিকে উড়তে দেখেছে। সেটি কোনো ধাতুর তৈরি এবং রোদ লেগে সেটি চিকচিক করছিল। যে ধাতুর তৈরি সেটি স্বাভাবিক ভাবেই উজ্জ্বল অথবা সেটি পালিস করা।

মিস উইংফিল্ড লণ্ডনে ফিরে এলেন। বান্ধবীর কাছ থেকে ফিলমটি চেয়ে এনেছিলেন। চার্লস গিবস-স্মিথের অধীনে মিস

উইংফিল্ড চাকরী করতেন। গিবস-স্মিথ হলেন অ্যাভিয়েশন হিস্টোরিয়ান। বিমানের ইতিহাস লিখতেন তিনি অতএব রহস্য-জনক এই উড়ুক্কু বস্তুটিতে তাঁর কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানা প্রশ্ন করলেন গিবস-স্মিথ। কতটুকুই বা আর দেখা। তবুও যেটুকু মিস উইংফিল্ড দেখেছিলেন তারই বিস্তারিত বিবরণী দিলেন এবং মিস মরটেনসনের তোলা সেই ফিলম-টিও দিলেন। সেই ফিলম হল একমাত্র প্রমাণ।

গিবস-স্মিথ ফিলমটি সম্বন্ধে বিশেষ যত্ন নিলেন এবং নিজে উপস্থিত থেকে খুব সাবধানতার সঙ্গে ফিলমটি ডেভালপ করালেন। নেগেটিভ পরিষ্কার হলেও উড়ুক্কু বস্তুটির ছবি খুব স্পষ্ট নয় তবে অনেক কিছু অনুমান করা যায়।

গিবস-স্মিথ বলেছিলেন নেগেটিভে বা নেগেটিভ থেকে ছাপা ছবিতে কোথাও কিছু রি-টাচ করা হয় নি। রি-টাচ করা হলে তা সহজে ধরা যায়। রিটাচিং-এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

নেগেটিভ থেকে এনলার্জ করে বেশ বড় ছবি তৈরি করা হয়েছিল। আকাশের গায়ে ছোট চ্যাপটা ও গোলাকার বস্তুটি এবং এক-প্রান্ত থেকে নির্গত আলোকশিখা ছবিতে উঠেছিল। এটি যে প্রচলিত কোনো এয়ারক্র্যাফট নয় এবং বেলুন, রকেট, স্পুটনিক বা উল্কা নয় সেটা বেশ বোঝা গিয়েছিল।

গিবস-স্মিথ বলেছিলেন যে পৃথিবীতে মানব সভ্যতা বেশি প্রাচীন নয়, ছ হাজার কি সাত হাজার বছর বড় জোর কিন্তু এমন গ্রহ থাকতে পারে যাদের সভ্যতা সত্তর হাজার অথবা সাত লক্ষ বছর প্রাচীন হতে পারে। সেই রকম কোনো গ্রহ থেকে এই ফ্লাইং সসার উড়ে এসে আমাদের আকাশে মাঝে মাঝে দেখা যায়।

ইংলণ্ডে ডংকাস্টারের কাছে ছোট শহর কনিসব্রু। সেই শহরের

লেসলি অ্যাভিনিউতে স্কুলের ছাত্র স্টিফেন প্র্যাট থাকে। বয়স পনেরো। তার একটা ক্যামেরা আছে।

১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে কোনো এক দিন স্টিফেন দোকান থেকে মাছ কিনে তার মায়ের সঙ্গে বাড়ি ফিবছিল। গোধূলির আলোয় চারিদিক আলোকিত।

আকাশের উত্তর-পুব দিকে মা আর ছেলে দুজনেই কমলা রঙের আলোর একটা রশ্মি দেখতে পেল। ওরা একটু কৌতুহলী হল। এমন সময় ওখানে কমলা রঙের আলো কোথা থেকে আসবে?

বাস্তায় যে সব সোডিয়াম ভেপরের আলো থেকে কমলা রং বিচ্ছুরিত হয় তাদের চেয়ে এ আলোর রং আবও গভীব। সেই আলো এক জায়গায় স্থির নেই, পশ্চিম দিকে সবে চলেছে।

ওদের বাড়ি কাছেই। বাড়ি ফিরেই স্টিফেন তাব বাবা ও দাদাকে সেই আলোর কথা বলে ক্যামেরা নিয়ে বাইবে এসে ছবি তুলল। আব একটু দেরী হলে ছবি নিতে পারত না কাবণ ছবি নেওয়ার একটু পবেই আলো মিলিয়ে গেল।

স্থানীয় এক ডাক্তারখানায় স্টিফেন ফিলমটা ডেভলাপ কবতে দিয়েছিল। ইংলণ্ডে ডাক্তারখানাতে এসব ব্যবস্থা থাকে।

স্টিফেন অসাধাবণ কিছু আশা করে নি। আকাশের বিচিত্র রং-টাকে তার ক্যামেরায় ধরে রাখবার চেষ্টা কবেছিল মাত্র।

কিন্তু নেগেটিভ ও ছবি যখন তৈবি হয়ে এল তখন দেখা গেল তিনটে ফ্লাইং সসার পর পব উড়ে চলেছে অথচ ছবি তোলবার আগে বা ছবি তোলবার সময় এদের দেখা যায় নি। ফিলম ডেভালপ করবার সময় কখনও সখনও কেমিক্যালের জন্যে বা ময়লা বা ধুলো-বালি পড়ে দাগ হয়ে যেতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে ভাল করে পরীক্ষা করে দেখা গেল যে এরকম কোন কাবণেব জন্য নেগেটিভে দাগ পড়ে নি।

সেই নেগেটিভ ও ছবি শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছল ডাঃ জেফ্রি

ডালের হাতে। ডাঃ ডাল হলেন ব্রিটিশ আনআইডেনটিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্টস রিসার্চ অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান। নিজে একজন ডাক্তার, রয়েল কলেজ অফ সার্জনস এর মেম্বার এবং খ্যাতনামা রেডিওলজিস্ট।

তিনি সেই নেগেটিভ ও ছবি পরীক্ষা করে বললেন যে কোথাও কোনো কারচুপি নেই এবং ঐ বস্তু তিনটি যে ফ্লাইং সসার সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া স্কুলের এক ছাত্র, আকাশে একটা দৃশ্য তার ভাল লেগেছে, সে ছবি তুলেছে, তার পক্ষে কারচুপি করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

তিন বছর আগে অনুরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল।

ইংলণ্ডে চেস্টারফিল্ডের কাছে মসবরো। সেই মসবরোতে মুর-ক্রিসেণ্ট পাড়ায় ১৪ বছর বয়সের বালক আলেকজাণ্ডার বার্চ তাঁদের বাড়ির পিছন দিকের বাগানে তার কুকুর ও দুই বন্ধুর ফটো তুলছিল।

কুকুরটা হঠাৎ আকাশের দিকে চেয়ে ঘেউ ঘেউ করে উঠল। ওরা সঙ্গে সঙ্গে আকাশের দিকে চেয়ে অদ্ভুত কিছু লক্ষ্য করল। বিমান নয় অথচ গোলাকার কয়েকটা বস্তু উড়ে চলেছে।

কুকুর ও বন্ধুদের ছবি তোলা স্থগিত রেখে অ্যালেক্স তার ক্যামেরা আকাশের দিকে ফোকাস করে ক্যামেরার শাটার টিপে দিল। পরে ফিলম ডেভালপ করে দেখা গেল কয়েকটা গোলাকার চ্যাপটা বস্তু সার বেঁধে আকাশে উড়ে চলেছে।

ক্যামেরা, নেগেটিভ ও ছবি পরীক্ষা করে এবং অ্যালেক্স ও তার বন্ধুদের জেরা করে জানা গিয়েছিল যে কোথাও কোনো কারচুপি করা হয় নি।

কেউ কেউ নাকি ফ্লাইং সসার জমিতে নামতে এবং পরে আবার উড়ে যেতে দেখেছে অথচ পরে সেই জায়গা পর্যবেক্ষণ করে অবতরণের কোনো সন্তোষজনক প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যে সব

প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল সেগুলি সন্তোষজনক নয়।

তবুও মাঝে মাঝে অদ্ভুত ঘটনা ঘটে।

১৯৬৭ সালের হেমন্তকালে বিলেতের সানডে এক্সপ্রেস পত্রিকায় একটি সংবাদ ছাপা হল যার শিরনাম হলঃ চাষীদের ক্ষেতে কি কোনো ইউ-এফ-ও ক্ষতি করেছে? খবরটি হল নিম্নরূপ ঃ

আইল অফ ওয়াইটে দুজন চাষীর বারলি ক্ষেতে ক্ষতির কারণ কি? প্রায় পৌনে এক মাইল দীর্ঘ একটা পথ ধরে কোনো ভারি বস্তু যেন বারলি গাছগুলি শুইয়ে দিয়ে গেছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে কয়েকজন কৃষি বিশেষজ্ঞ এবং বিমান বিজ্ঞানী কারণ খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

ব্রিটিশ হোভারক্র্যাফট করপোরেশনের এরোনটিক্যাল টেকনিশিয়ান লেনার্ড ক্র্যাম্প বলছেন যে নিঃসন্দেহে কোনো ইউ-এফ-ও অবতরণের চেষ্টা করছিল বা অবতরণ করেছিল যার চাপের ফলে বারলি গাছগুলি শুয়ে পড়েছে।

চাষীরা কিন্তু বিশেষজ্ঞদের এই অভিমত গ্রহণ করতে রাজি নয়। তারা ফ্লাইং সসারের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নয় অথচ তারা অন্য কিছু বলতেও পারছে না। ইতিমধ্যে এই অঞ্চলে এমন ঝড় বা বৃষ্টিও হয় নি যা বারলি শস্যের ক্ষতি করতে পারে।

ঐ অঞ্চলে ঐ সময়ে কোনো ফ্লাইং সসার দেখা গেছে কিনা খোঁজ করবার জন্যে একদল ইউ-এফ-ও অনুসন্ধানকারী এসেছিল। লেনার্ড ক্র্যাম্প তাদের কোনো সাহায্য করতে পারে নি।

ইউ-এফ-ও অনুসন্ধানকারীরা নিরুৎসাহ না হয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে যেতে থাকল। বহু ব্যক্তিকে তারা প্রশ্ন করতে লাগল। হত্যাকারী অথবা খুনের সূত্র 'অনুসন্ধানের জন্যে ডিটেকটিভ যেমন বহু ব্যক্তিকে নানারকম প্রশ্ন করে সেইভাবে এরাও খোঁজ করতে লাগল।

অবশেষে আইল অফ ওয়াইটের নিউ পোর্টে অবস্থিত হুইপিংহ্যাম

প্রাইমারি স্কুলের একটি ছাত্র বলল যে সে এবং তার একজন সহপাঠী আকাশে অদ্ভুত কিছু দেখেছে।

কবে দেখেছে? প্রশ্ন করা হল।

ছাত্ররা তারিখ বলল। তারিখ মিলে যাচ্ছে। চাষীরা যে তারিখে তাদের ক্ষেতে ক্ষতি লক্ষ্য করেছিল, ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা আগে।

ছাত্র দুটি বলল যে তারা স্কুলে ঢোকবার জন্য বাইরে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে। বেলা তখন পৌনে ন'টা। আকাশ পরিষ্কার।

একজন ছাত্র তার কনুই দিয়ে অপর ছাত্রটিকে আঘাত করে আকাশের দিকে চাইতে বলল। দূর আকাশে দুধের মতো সাদা একটি চক্রাকার বস্তু তারা দেখতে পেয়েছিল। মনে হয়েছিল স্থান-চ্যুত হয়ে চাঁদই বুঝি আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বস্তুটি তারা বেশিক্ষণ দেখতে পায় নি কারণ কড়া মাস্টার মশাই-এর তাগিদে তারা ক্লাসরুমে ঢুকে পড়তে বাধ্য হয়। কিন্তু সাড়ে দশটার সময় তারা যখন বাইরে আসে তখন আবার তারা কৌতূহল-বশে আকাশের দিকে চেয়ে দেখে। সঙ্গে আরও ছাত্র ছিল।

তারা সকলেই অনেক উঁচুতে একটি দুটি নয়, ঐ রকম বারোটি বস্তু দেখতে পায়। তারপর হঠাৎ তারা দেখে যে সেই বস্তুগুলি যেন পড়ে যাচ্ছে, ঝড়ের সময় গাছ থেকে যে ভাবে পাতা পড়ে ঠিক সেই ভাবে। কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ওরা যেন নিজেদের সামলে নিয়ে আবার সার বেঁধে উড়তে থাকে এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ওদের দৃষ্টির আড়ালে চলে যায়।

একজন ছাত্র বলল সেদিন সে যখন বাসে চেপে বাড়ি ফিরছিল তখন সে দেখেছিল বারলি ক্ষেতে লম্বা এক সার গাছ কে যেন মাড়িয়ে চলে গেছে। সব গাছ গোড়া ভেঙে শুয়ে আছে। যে গাছগুলি মাড়িয়েছে না জানি তার পা কত বড়! সেই বারলি ক্ষেত হল নিউ পোর্ট-ইস্ট কাওয়েস রোড বরাবর।

মিঃ লেনার্ড ক্র্যাম্প তার রিপোর্টে লিখলেন বারলি ক্ষেতের

যেখানে ক্ষতি হয়েছে সেখানে লক্ষ্য করলে বেশ বোঝা যায় গাছগুলির ওপর ভারি কোনো বস্তু যেন ঘোরানো হয়েছিল। গাছের ডাঁটাগুলি সেইভাবেই বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বারলি ক্ষেত ছাড়া দ্বীপে অন্যত্র ঝোপ-ঝাড়ের ওপর অনুরূপ ধরনের ক্ষতি লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

ক্ষতি কিভাবে হয়েছে চাষীরা তা বলতে পারে না তবে ঝড় বা জীবজন্তু এইরকম ক্ষতি করতে পারে না। কি যে হয়েছে তা তারা অনুমান করতে পারছে না। কোথায় যেন কে পাগলামী করে গেছে।

ক্যালিফরনিয়া মাউন্ট প্যালোমার অঞ্চলের আকাশে সম্ভবতঃ চুম্বকপথের উপস্থিতির জন্যে যেমন আন আইডেন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট (ইউ-এফ-ও) বা ফ্লাইং সসারদের ঘন ঘন যাওয়া আসা আছে তেমনি ওদের যাওয়া আসা আছে ইংলণ্ডের উইল্টশায়ার জেলার ওয়ারমিনিস্টার শহরের ওপর দিয়ে। নজর রাখলে ওখানকার আকাশে ইউ-এফ-ও দেখা যায়।

১৯৬৪ সালের বড়দিনে ঐ শহরে একটা বিচিত্র ঘটনা ঘটল।

বড়দিন উপলক্ষ্যে সেদিন এক মহিলা গির্জায় যাচ্ছিলেন। পথে যেতে যেতে তাঁর সারা অঙ্গে যেন ইলেকট্রিক শ্যক্ লাগল, আকাশ থেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ নেমে এসে তাঁকে যেন আঘাত করল।

মহিলা খুব ভয় পেয়েছিলেন এবং কোথা থেকে কি ঘটল তিনি স্পষ্টকরে কিছু বলতে পারলেন না। মহিলার এই ঘটনার পর আরও কয়েকজন ব্যক্তির অনুরূপ অভিজ্ঞতা হল। তাঁরা বলেন আকাশ থেকে যেন অদৃশ্য একটা বৈদ্যুতিক তার নেমে এসেছিল, তাঁরা যেন তারটা ছুঁয়ে ফেলেছেন।

এরই পরে আকাশে নানা আকারের ইউ-এফ-ও দেখা যেতে লাগল। এই ঘটনা বেশ কিছুদিন থেকে চলতে লাগল।

১৯৬৩ সালে ১৩ মে তারিখে ঐ শহরে রাত্রি বেলায় বেশ বড় একটি ফ্লাইং সসার দেখা গেল এবং তারপর কয়েক দিনের মধ্যে আরও কয়েকটি।

ঐ শহরের সর্বজন শ্রদ্ধেয় একজন সাংবাদিক আর্থার সাটলউড বলেন যে মাঝে মাঝে এখানে ফ্লাইং সসার তো দেখা যায়ই কিন্তু আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য ব্যাপার হল যে আকাশে কিছু দেখা না গেলেও বিচিত্র সব শব্দ শোনা যায়। শব্দ যে ঠিক কি রকম বলতে পারা যায় না কিন্তু মনে হয় যেন বাড়ির ছাদ ভেঙে পড়ল। মাঝে মাঝে আকাশে উজ্জ্বল আলো দেখা যায়। চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অগ্নি-পিণ্ডও কেউ কেউ দেখেছে আর দেখেছে আকাশে বিরাট সিগারের আকৃতির ইউ-এফ-ও। অবিশ্বাস্য হলেও এবং কোনো কারণ খুঁজে না পাওয়া গেলেও এই সময় রাস্তায় চলতি মোটর থেমে গেছে।

সাটলউড তাঁর এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। ১৯৬৫ সালের ২৯ অগস্ট বেলা পৌনে চারটের সময় তিনি যখন তাঁর ফ্ল্যাটে বসবার ঘরে কাজ করছিলেন তখন জানালার ভেতর দিয়ে সিগারের মতো বিরাট একটি ইউ-এফ-ও দেখতে পান। সেটির রং ছিল সাদা ও অ্যামবারে মেশানো।

ছবি নেবার জন্যে আলমারি থেকে তিনি তাঁর মুভি ক্যামেরা বার করলেন তারপর জানালা দিয়ে ক্যামেরা ফোকাস করতে না করতে তাঁর মনে হল তাঁর হাতে তাঁরই ক্যামেরা দিয়ে কে যেন সজোরে আঘাত করল। প্রথমে তাঁর বাঁ হাতে এবং পরে তাঁর মুখে সেই আঘাত, কিন্তু তবুও তিনি ছবি নিতে পেরেছিলেন। তারপরই সেই বস্তুটি বড় একটা মেঘের আড়ালে চলে যায়। আড়াল থেকে বস্তুটি যখন বেরিয়ে এল তখন সেটি অনেক দূরে চলে গেছে।

মাত্র কয়েক সেকেণ্ড এবং এই কয়েক সেকেণ্ডে সে যে দূরত্ব অতিক্রম করেছিল তাতেই তার প্রচণ্ড গতি অনুমান করা যায়। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই ছোট হতে হতে ক্ষুদ্র একটি বিন্দুতে

পরিণত হয়ে আকাশে মিলিয়ে গেল।

ইউ-এফ-ও সিগার তো মিলিয়ে গেল কিন্তু তার মুখের কয়েকটি পেশী নাচতে লাগল এবং বাঁ চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। পেশী নৃত্য থেমে গেলেও চোখের জল পড়া দুদিনের আগে বন্ধ হয় নি। চোখে জল পড়া বন্ধ হবার পরও চোখে অন্যান্য অসুবিধা সহ্য করতে হয়েছিল। বাঁ হাতের ব্যথাও দিন দুই ছিল।

সেদিন সেই সিগার-ইউ-এফ-ও কিন্তু আর কারও নজরে পড়ে নি। সম্ভবতঃ সেটি শহরের ওপর দিয়ে যায় নি বলে বোধহয়। কিন্তু ফিল্ম ডেভালপ করবার জন্যে ক্যামেরা খুলে দেখা গেল যে স্পুল থেকে বিচ্যুত হয়ে ফিল্মটি এলোমেলো ভাবে পাকিয়ে রয়েছে অতএব ছবি ওঠে নি।

এসবই অবিশ্বাস্য কিন্তু ঘটেছিল। সাটলউডকে অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই।

ওয়ারমিনিস্টারের প্রতি ইউ-এফ-ও-গুলির বোধহয় পক্ষপাতিত্ব আছে কারণ মাঝে মাঝেই এরা ওয়ারমিনিস্টারের আকাশে বিচরণ করতে লাগল।

স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চারজন কর্মী এক দিন সকালে যখন কর্মরত ছিল তখন তারা আকাশে রূপালি রঙের ও সিগারের মতো আকৃতির বিরাট একটা ইউ-এফ-ও দেখতে পেল। তারা দেখল যে সেই বিরাট সিগারটি যেন ছয় ভাগে ভাগ হয়ে প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক ফ্লাইং সসারে রূপান্তরিত হয়ে চক্কর দিতে দিতে আকাশে মিলিয়ে গেল।

কয়েক দিন পরে ব্যাংক অফ ইংলণ্ডের একজন কর্মী যখন তাঁর মোটরে চেপে ওয়ারমিনিস্টার থেকে অন্যত্র যাচ্ছিলেন তখন অনুরূপ দৃশ্য দেখেন। সেই বিরাট সিগার ভাগ হয়ে দুটি ফ্লাইং সসারে রূপান্তরিত হয়ে আকাশে হারিয়ে গেল।

রেভারেণ্ড গ্রেহাম ফিলিপসের পত্নী মিসেস প্যাট্রিসিয়া ফিলিপস

১৯৬৫ সালের জুন মাসের কোনো এক তারিখে তাঁর ঘরে বসে কিছু কাজ করছেন।

রাত্রি তখন ৯টা। পাশের ঘরে তাঁর ১২ বছরের ছেলে নাইজেল তার স্কুলের পড়া তৈরি করছে এমন সময় সে চিৎকার করে উঠল, দেখে যাও, দেখে যাও।

বাড়ির সকলে তার ঘরে ছুটে গেল। জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দূর আকাশে নাইজেল একটা কিছু দেখাচ্ছে। মিসেস ফিলিপস এবং আর সকলে দেখলেন যে দূরে আকাশে সিগারের আকৃতির একটি ইউ-এফ-ও ঝকঝক করছে। কোনোরকম আলো সেটিকে আবৃত করে রেখেছে।

বাড়িতে একটা দূরবীন রয়েছে। সেটা খুব শক্তিশালী নয়। মিসেস ফিলিপস সেই দূরবীন দিয়ে দেখলেন যে সেটি আকাশে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নীচের দিক ওপর দিক অপেক্ষা মোটা এবং সেদিকে যেন একটি চাকা পরানো রয়েছে। নীচে বা ওপর দিক থেকে কোন গ্যাস বা অগ্নিশিখা নির্গত হতে দেখা যায় নি।

আলোকের উৎস সূর্যকিরণ হতে পারে। ইউ এফ-ওটি অনেক উঁচু আকাশে ছিল। সেই উচ্চতায় পৃথিবীতে অদৃশ্য হলেও সূর্য-কিরণ পড়তে পারে। ইউ-এফ-ওটি কোনো ধাতুর তৈরি বলেই মনে হয়েছিল।

এতদিন সিগার আকৃতির যত ইউ-এফ-ও দেখা গিয়েছিল তাদের চেয়ে এর আকৃতি কিছু ভিন্নরকম এবং পূর্বের ইউ-এফ-ও-গুলি আকাশে সমান্তরালভাবে দেখা যেত কিন্তু এটি দেখা গেল খাড়া অবস্থায়।

মিসেস প্যাট্রিসিয়া ফিলিপস ইউ-এফ-ও-টিকে কুড়ি মিনিট ধরে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন অতএব যেটুকু দেখেছিলেন ভাল করেই দেখেছিলেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর দূরবীনটির শক্তি কম নইলে তিনি হয়তো আরও কিছু দেখতে পেতেন।

বিশেষ ঐ ইউএফও-টির একটি ডাক নাম দেওয়া হল, 'ওয়ার-মিনিস্টার থিং'। কয়েকমাস পরে সেপ্টেম্বর মাসে এক রাত্রে সেটিকে আবার দেখা গেল। এবার দেখল একসঙ্গে দুশো লোক।

খবরের কাগজে সংবাদটি ছাপা হবার পরই 'ওয়ারমিনিস্টার থিং' দেখবার জন্যে ওয়ারমিনিস্টার শহরে ভিড় বেড়ে গেল। অনেকেই শক্তিশালী দূরবীন সঙ্গে নিয়ে এলেন, কেউ কেউ পর্যায়ক্রমে দিন রাত্রি আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন, যদি এক মিনিটের জন্যেও সেটিকে দেখা যায়।

কিন্তু হায়। 'ওয়ারমিনিস্টার থিং' সকলকে সেবার নিরাশ করল।

রাত্রে মাঝে মাঝে আকাশে একটা শব্দ শোনা যায়। বিরাট সিগারটি দেখবার আশায় অনেকে ছুটে যায়। কিন্তু কোথায় কি? তাহলে ঐ শব্দ কিসের?

পুলিশ পক্ষ থেকে বলা হল আওয়াজগুলি হল বকের ডানার। একসঙ্গে শতশত বক উড়ে যায়, আওয়াজ হল তাদের ডানার। এ আওয়াজ আগেও ছিল পরেও হবে কিন্তু তখন শহরবাসীরা কান পেতে শোনেন নি। ইউ-এফ-ও দেখা যাওয়ার পর থেকে শহরবাসীরা যেন অনেক অদ্ভুত দৃশ্য দেখছেন অথবা বিচিত্র ঘটনা লক্ষ্য করছেন, তাদের নানারকম ব্যাখ্যা করছেন। পুরনো জিনিস তারা নতুন চোখে দেখছেন।

সেই সাংবাদিক আর্থার সাটলউড বলেন যে ইউ-এফ-ও বা ফ্লাইং-সসার যারা চালায় তারা গ্রহান্তরের কোনো বুদ্ধিমান জীব। উইল্টশায়ার জেলার ঊর্ধ্ব আকাশে এমন কিছু আছে যা ঐ সব অপার্থিব যানের সহায়ক সেইজন্যে যাওয়া আসার পথে ঐগুলি এখানকার আকাশে দেখা যায়।

ইউ-এফ-ও বা ফ্লাইংসসার দেখতে যারা একান্ত আগ্রহী তারা নিয়মিত ভাবে দিনরাত্রি আকাশে নজর রাখলে ওদের দেখা পাবেন

তবে কতদিনের মধ্যে বা কোন সময়ে তা বলা যায় না।

ইউ-এফ-ও-এর প্রতি নজর রাখবার জন্যে সাটলউড একটা ভাল জায়গার সন্ধান পেয়েছেন। জায়গাটি হল ওয়ারমিনিস্টার রেলওয়ে স্টেশনের পশ্চিম দিকে ক্রেডল হিল নামে একটি উচ্চ ভূমি।

সাটলউডের বন্ধু আর একজন খ্যাতনামা সাংবাদিক রবার্ট চ্যাপম্যান বন্ধুর আমন্ত্রণে ইউ-এফ-ও দেখবার উদ্দেশ্যে ক্রেডল হিলে গিয়েছিলেন। চ্যাপম্যানও ফ্লাইংসসার সম্বন্ধে বই ও প্রবন্ধ লিখেছেন।

১৯৬৮ সালের মে মাসের কোনো এক তারিখে চ্যাপম্যান ক্রেডল হিলে পৌঁছলেন। সেদিন আবার আকাশ ঘন মেঘে ঢাকা, চারদিক অন্ধকার। হেডলাইট জ্বেলে গাড়ি চালাতে হচ্ছে, সোঁ সোঁ বাতাস বইছে, ঝির ঝির বৃষ্টি।

কাছের মানুষ দেখা যায় না তো ইউ-এফ-ও দেখা যাবে কি করে? সারাদিন ও বিকেল কেটে গেল। সন্ধ্যার মুখে বৃষ্টি ধরল কিন্তু আকাশ পরিষ্কার হল না।

সাটলউড ও চ্যাপম্যান দুজনে পালা করে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন কখন তিনি দর্শন দেবেন এই আশায়। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করে চ্যাপম্যান নিরাশ হলেন। আর পারা যাচ্ছে না। তার ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে।

জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চ্যাপম্যান উঠে পড়লেন। কিন্তু দূর আকাশে ঐ আলোটা কি? নিঃসন্দেহে কোনো নক্ষত্র নয়। মেঘাবৃত আকাশের জন্যে কোনো নক্ষত্র চোখে পড়ার কোনো আশা ছিল না। বিমানের আলোও নয়। কোনো বিমানে ঐ রকম আলো থাকে না। তবে ওটা কি? বেশিক্ষণ দেখতে হল না। স্থির হয়ে কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে আলো যেন হারিয়ে গেল।

কয়েক মিনিট পরে আবার সেই আলো সেই একই জায়গায় দেখা গেল। একই ভাবে নিশ্চল আবার মিলিয়ে গেল। আবার

দেখা গেল কয়েক মিনিট পরে তবে এবার একা নয়, একজন সঙ্গী আছে। দুটি আলোই খুব উজ্জ্বল। মিনিট কুড়ি ধরে এই খেলা চলল তারপর আলো আর দেখা গেল না।

মোটরগাড়ির হেডলাইট বা রেল এঞ্জিনের সার্চলাইটও নয়। সেখানে এই দুটির কোনোটি দেখার সম্ভাবনা ছিল না। এই প্রথম বোধহয় একই জায়গায় বার বার সেই রহস্যময় আলো দেখা গেল, যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

ওয়ারমিনিস্টার ছাড়া আর কোনো অঞ্চলে ঐ রকম আলো পর-পর দু'বার দেখা যায় নি, একই দিনে তো নয়ই এমন কি পরেও নয়। এও এক রহস্য।

ব্যতিক্রম অবশ্য আছে তাও দু একবার মাত্র ঘটেছে।

অ্যালান ওয়াটস একজন আবহাওয়াবিদ। আবহাওয়ার পূর্বা-ভাষ সম্বন্ধে তিনি বই লিখে খ্যাতি লাভ করেছেন। ইউ-এফ-ও সম্বন্ধেও তিনি অনেক পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছেন।

অ্যালান ওয়াটসই প্রথম লক্ষ্য করেন যে ইউ-এফ-ও-এর আলো ওয়ারমিনিস্টার ব্যতীত একই জায়গায় একাধিকবার দেখা যায় নি। কিন্তু ১৯৬৩ সালে এসেকসে ৩০ জুন থেকে ২ জুলাইয়ের মধ্যে একাধিকবার ইউ-এফ-ও এর নিশ্চল আলো দেখা গিয়েছিল।

রহস্যময় ঐ আলোর এই প্রকৃতি নিয়ে ফ্লাইং সসার রিভিউ পত্রিকায় অ্যালান ওয়াটস মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

তিনি আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ্য করেন। এসেকসের হলস্টেডের আকাশে ৩০ জুন থেকে ২ জুলাই ১৯৭১ তারিখে যে রহস্যময় আলো. আকাশের যে কোণে দেখা গিয়েছিল, ঠিক পাঁচ বছর আগে ১৯৬৬ সালে এবং পাঁচ বছর পরে ১৯৭৬ সালে প্রায় একই তারিখে ও একই সময়ে আলোগুলি হাজিরা দিয়েছিল।

তাহলে কি ওরা পাঁচ বছর অন্তর অন্তর একই আকাশে ফিরে ফিরে ফিরে আসে?

তবে আলোর প্রকৃতি প্রতিবার এক রকম ছিল না। সর্বপ্রথম ১৯৬১ সালে একটি আলো দেখা যায় সেটি ছিল কয়েকটি আলোর একটি মালা।

একজন পর্যবেক্ষক উল্লেখ করেছেন ছ'টি আলোর মালা এবং আর একজন পর্যবেক্ষক বলেছেন ন'টি আলোর মালা। আরও একজন পর্যবেক্ষক সেদিন একটি ফ্লাইং সসার দেখেছিলেন বলে দাবি করেন।

১৯৬১-এর পর ১৯৬৬ সালে একটি মাত্র আলো দেখা গিয়েছিল। আলোর প্রকৃতি ছিল রুপালি সাদা কিন্তু মাথার দিকের রং কমলা। মনে হয়েছিল আলোটি যেন খুব আস্তে আস্তে ঘুরছে। এক সময়ে মনে হল একটি আলো নয়, দুই রঙের দুটি পৃথক আলো। একটি কমলা, অপরটি রুপালি। আলোকিত বা আলোকময় দুটি পৃথক গোলাকার বস্তু যেন জোড়া লেগে আছে। মাঝে মাঝে নীচের অংশ নিষ্প্রভ হয়ে যাচ্ছে।

ব্রিস্টল ইউনিভারসিটি এবং ইমপিরিয়াল কলেজ মাঝে মাঝে কারডিংটন থেকে কসমিক রশ্মি গবেষণার জন্যে বায়ুমণ্ডলে রিসার্চ বেলুন পাঠান। সেরকম কেনো বেলুন নয় তো ? খোঁজ নিয়ে জানা গেল কেউ বেলুন পাঠায় নি।

সেই আলো যে দূরত্বে ও উচ্চতায় ছিল সেই পরিপ্রেক্ষিতে অ্যালান ওয়াটস আলোর আকারের একটা হিসেব করলেন। বেলুন হলে তার ব্যাস হত ২৫০ থেকে ৪০০ ফুট। অথচ ৪০০ ফুট ব্যাসের একটি বেলুন তৈরি করতে গেলে এবং সেই রহস্যময় আলোর উচ্চতায় পাঠাতে হলে তাতে গ্যাস ভরতে হবে দশ লক্ষ কিউবিক ফুট। এরকম কোনো বেলুন আজও তৈরি হয় নি।

কোনো একটি টেকনিক্যাল কলেজের নাইটস্টাফ একদিন রাত্রে নিকট আকাশে একটি জ্বল জ্বলে আলোকপিণ্ড দেখতে পায়। সেই আলোকপিণ্ড থেকে ছোট সাদা একটি আলোকপিণ্ড তীর বেগে

বেরিয়ে এসে দক্ষিণ-পুর্ব দিকে কিছু দূর গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। উল্কা নয়। উল্কা সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা আছে।

অ্যালান ওয়াটস অনুমান করছেন যে আমরা যেমন সমুদ্রে এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার বা বিমানবাহী জাহাজ পাঠাই এবং সেই বিমানবাহী জাহাজের ডেক থেকে বিমান আকাশে উঠে যায় এবং পরে ফিরে আসে, মহাকাশের এই ব্যাপারটাও ঠিক সেইরকম।

কোনো গ্রহের কোনো বুদ্ধিমান জীব সিগার আকৃতির এক একটি ফ্লাইং সসার ক্যারিয়ার পাঠায়। সেই বিরাট সিগার থেকে ফ্লাইং সসার বেরিয়ে এসে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। তাদের পরিচালনা করে সেই সিগার। সিগারের ভেতরে কোনো কন্ট্রোলরুম আছে বোধহয়।

ফ্লাইং সসার রহস্যের সমাধান হয় নি। ইতিমধ্যে অনেক তথ্য জানা হয়ে গেছে কিন্তু বিভিন্ন দেশের সরকার অধিকাংশ তথ্য গোপন রেখেছেন।

এগুলি আসছে কোথা থেকে? এথিরিয়া থেকে?

কিছুদিন যাবৎ 'ব্যারমুডা ট্র্যাঙ্গল' নামে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। না, এটা জ্যামিতির কোনো ব্যাপার নয়। অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের পুব দিকে রহস্যময় একটি এলাকার নাম দেওয়া হয়েছে 'বারমুডা ট্র্যাঙ্গল'।

উত্তরে বারমুডা থেকে দক্ষিণে পুয়েরটো রিকো এবং সেখান থেকে পশ্চিমে ফ্লোরিডা পার হয়ে গালফ অফ মেকসিকোর কোনো এক বিন্দু পর্যন্ত কাল্পনিক রেখা টানলে যে ত্রিকোণ রচিত হবে সেই ত্রিকোণটিকেই বলা হচ্ছে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল।

সেই কলম্বাসের সময় থেকে এখানে রহস্যজনকভাবে জাহাজ নিখোঁজ হচ্ছে যার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায় না।

আকাশে বিমান উড়তে আরম্ভ করার পর থেকেও অনেক

বিমান নিখোঁজ হয়েছে। তারা কোথায় গেছে কেউ জানে না, কোনো হদিশ পাওয়া যায় নি।

বারমুডা ট্র্যাঙ্গেলের ওপরের আকাশকে বৈমানিকেরা বলে স্কাই ট্র্যাপ।

রহস্যজনক ভাবে বিমান নিখোঁজ হওয়ার পশ্চাতে ফ্লাইংসসার-দের হাত আছে বলে অনেকে অনুমান করছেন।

'সি-১১৯ ফ্লাইং বক্সকার' মালবাহী একরকম মার্কিন বিমানের নাম। এই বিমানগুলি প্রধানতঃ মার্কিন এয়ারফোর্সের। এইরকম একখানা বিমান ১৯৬৫ সালের জুন মাসে বারমুডা ট্র্যাঙ্গল এলাকায় নিখোঁজ হয়। বিমান অথবা তার ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বার করার চেষ্টার কোনো ত্রুটি করা হয় নি কিন্তু বিমান পাওয়া দূরের কথা তার বিষয়ে কোন খবরই পাওয়া যায় নি। হারিয়ে যাওয়া বিমানে বিমানেরই যন্ত্রাংশ বোঝাই ছিল এবং পাইলট, রেডিও অপারেটর ক্রু ইত্যাদি নিয়ে দশজন লোক ছিল।

বিমান হারিয়ে যাবার পূর্ব মুহূর্তে গ্র্যাণ্ড টুর্ক কণ্ট্রোল টাওয়ার ঐ বিমান থেকে একটা বার্তা পেয়েছিল কিন্তু সে বার্তা অত্যন্ত অস্পষ্ট ছিল। কণ্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও অপারেটর কিছুই বুঝতে পারে নি।

বিমানখানার দুখানা এঞ্জিন ছিল। একখানা যদি খারাপ হয়ে থাকে তাহলে সেটা তো পাইলট কণ্ট্রোল টাওয়ারে জানাতে পারত কিন্তু পাইলট তা জানায় নি। হয় তো জানাতে চেয়েছিল কিন্তু কোনো অলৌকিক বা রহস্যজনক কারণে তা জানানো সম্ভব হয় নি। পাইলট যা বলেছিল তার কিছুই বোঝা যায় নি।

মার্কিন মহাকাশ যান জেমিনী-ফোর এই সময়ে মহাকাশ ভেদ করে ছুটে চলেছিল। জেমিনী-ফোর-এর অন্যতম অ্যাস্ট্রোনট জেমস ম্যাকডেভিট আকাশে একটি ইউ-এফ-ও দেখেছিল তার নাকি বিরাট একটা বাহু ছিল। এই ইউ-এফ-ও-টি দেখার কিছু পরে ম্যাক-

ডেভিট ও তার সঙ্গী অ্যাস্ট্রোনট এড হোয়াইট আরও একটি রহস্য-জনক উড়ন্ত বস্তু দেখে বিস্মিত হয়েছিল। এটিরও একটি বাহু ছিল। ওরা দুজনেই নিশ্চিত যে এটি কোনো উপগ্রহ নয়। সে সময় কোনো দেশ কোনো উপগ্রহ আকাশের ঐ উচ্চতায় পাঠায় নি। তা ছাড়া উপগ্রহ চেনার মতো জ্ঞান ম্যাকডেভিট এবং এডগার হোয়াইটের ছিল।

যে বস্তুটি বা দুটি বস্তু তারা মহাকাশে দেখেছিল সেটি উপগ্রহ নয়, কিন্তু কি তারা জানে না। তাদের অনুমান ওটি একটি আন-আয়ডেনন্টিফায়েড ফ্লাইং অবজেক্ট।

মহাশূন্যে তখন পেগেসাস-টু নামে একটি উপগ্রহ তার কক্ষপথে ঘুরছিল। এই উপগ্রহটির ৯৬ ফুট দীর্ঘ একটি অ্যানটেনা ছিল। একজন প্রশ্ন তুলেছিলেন যে অ্যাস্ট্রোনট ম্যাকডেভিট এবং এড হোয়াইট ঐ পেগেসাস-টু দেখে ভুল করেছে এবং ঐ অ্যানটেনাটিকে বাহু মনে করেছে।

তথ্যটি সঙ্গে সঙ্গে যাচাই করে দেখা গেল যে জেমিনী ফোর-এর কক্ষপথ থেকে পেগেসাস-টু তখন অন্ততঃ কয়েক হাজার মাইল দূরে ছিল এবং সে নিজ কক্ষপথ থেকেও দূরে সরে যায় নি।

ইন্টারন্যাশানাল ইউ-এফ-ও ব্যুরো সন্দেহ করলেন যে ম্যাকডেভিট যে ইউ-এফ-ও দেখেছিল সেই ইউ-এফ-ও সি-১১৯ ফ্লাইং বক্সকার বিমান খানা নিয়ে গেছে।

'দি বারমুডা ট্র্যাঙ্গল মিষ্ট্রি সলভড' বইখানির লেখক লরেন্স ডেভিড কুশচে অ্যাস্ট্রোনট জেমস ম্যাকডেভিটকে একখানি চিঠি লিখেছিলেন। কুশচে জানতে চেয়েছিলেন ম্যাকডেভিট আকাশে কি দেখেছিলেন। ম্যাকডেভিট চিঠির যে উত্তর দিয়েছিলেন তা নীচে হুবহু তুলে দেওয়া হল ঃ

In reply to your letter of January 22, I would like to say that during my flight of Gemini-4. I did indeed

see what some people would call a UFO. I think it is important to realize that the letters UFO stand for Unidentified Flying Object.

The object which I saw remains unidentified.

This does not mean that it is, therefore a spacecraft from some remote planet in the universe, It also doesn't mean that isn't such a spacecraff, It only mean that I saw something in flight which neither I nor any one else was ever able to identify.

এই ঘটনার কিছুদিন পরে বৈমানিক সমেত একখানি বিমান কোথায় হারিয়ে গেল কে জানে।

বাহামার ন্যাসো এয়ারফিল্ডের কন্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও অপারেটর একজন বৈমানিকের কাছ থেকে সেদিন ভাঙা ভাঙা অস্পষ্ট একটি বার্তা পেলেন। বার্তা সত্যিই অস্পষ্ট। শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যে সেই বৈমানিকের বিমানের রেডিও প্রেরক যন্ত্রটি ঠিক মতো কাজ করছে না, কোথাও বিগড়েছে।

সেদিন আকাশ ছিল পরিষ্কার, কোথাও এক খণ্ড মেঘ ছিল না। এমন নির্মেঘ আকাশে বৈমানিকরা নাকি বিনা কম্পাসের সাহায্যে গন্তব্যস্থলে বিমান চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

কন্ট্রোল টাওয়ারের অপারেটর এইটুকু বুঝল যে সেই বৈমানিক দিকভ্রান্ত হয়েছে। বৈমানিক এখন আকাশে কোথায় আছে অপারেটর তাকে তা জানিয়ে দিল কিন্তু সেই বৈমানিক তবুও তার রাস্তা ধরতে পারল না। সে বার বার জিজ্ঞাসা করতে লাগল কোন দিকে যাবে?

বৈমানিক যেন বলছে যে চার দিকে ঘন সাদা কুয়াশা আর সেই কুয়াশার মধ্যে সে ডুবে যাচ্ছে।

কুয়াশা? কোথায় কুয়াশা? এখানে এই ন্যাসো কন্ট্রোল

টাওয়ার থেকে যতদূর দৃষ্টি চলে কুয়াশার চিহ্ন মাত্রও নেই।

অথচ কি ব্যাপার কিছুই বোঝা গেল না। বৈমানিকের সঙ্গে সকল যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হল। সেই বৈমানিককে বা তার বিমান আর কোথাও দেখা যায় নি। বিমানের ভগ্নাবশেষ বা বৈমানিকের মৃতদেহও কোথাও পাওয়া যায় নি।

সমুদ্রের ওপর বিমান ভেঙে পড়লে কিছু না কিছু নিদর্শন পাওয়া রায়। বিমানের ভাঙা টুকরো বা আর কিছু। জলের ওপর তেল ভাসতেও দেখা যায়। কাছাকাছি কোনো বিমান বা জাহাজ বিপদ সংকেত পায়, কিন্তু এ ক্ষেত্রে কিছুই পাওয়া যায় নি।

ইউ-এফ-ও বা ফ্লাইং সসার নিয়ে যারা কাজকর্ম করছেন তারা কেউ কেউ বললেন মাঝে মাঝে মহাকাশে সিগারের মতো যে বিরাট বস্তু বা ইউ-এফ-ও দেখা যায় তারা আকাশে দুর্ভেদ্য কুয়াশার সৃষ্টি করে আমাদের বিমান টেনে নিয়ে যায়।

কোথায় টেনে নিয়ে যায় বা কেন টেনে নিয়ে যায় তা আজও জানা যায় নি। তাদের রাজ্য থেকে যদি কোনো বৈমানিক কোনো-দিন ফিরে আসতে পারে বা ওরা ফেরত দেয় তাহলে হয় তো জানা যেতে পারে।

এইরকম একটা সন্দেহ অনেকের মনে দানা বাঁধতে লাগল। এরকম কিছু ঘটে বোধহয় নইলে মার্কিন বিমান বহরের পাঁচ পাঁচ-খানা নতুন বিমান ও তাদের খোঁজ নেবার জন্যে পাঠানো আর এক-খানা বিমান কোথায় যাবে?

রহস্যকাহিনীতেই এমন ঘটনা পড়া যায়।

১৯৪৫ সাল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ পর্যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা স্টেটের একটি নেভাল বেস। সেখানে নৌবহর থাকলেও একটি বিমানক্ষেত্রও আছে। বিমান ক্ষেত্রটির নাম সেসিলফিল্ড।

ফ্লোরিডার আবহাওয়া তখন চমৎকার। আবহাওয়ার পূর্বাভাষেও কোনো ঝড় বৃষ্টি বা মেঘলা আকাশের সংকেত নেই। সেদিনও আকাশ পরিষ্কার।

সেসিলফিল্ড এয়ারবেসে পাইলটদের ডাইভ বম্বিং এ ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল। 'ডন্টলেস' নামে নতুন বিমান তৈরি হয়েছিল। সেই বিমান নিয়ে পাইলটরা আকাশে উঠে ডাইভ বম্বিং-এর মহড়া দিয়ে আবার ফিরে আসত। এটি দৈনন্দিন একটি রুটিন ট্রেনিং। এর একটা নামও দেওয়া হয়েছিল, 'ওভারওয়াটার নেভিগেশানাল ফ্লাইট'। প্রতিদিন বিকেলে সমুদ্রের ওপর এই মহড়া চলত।

ডন্টলেস বিমানের কিছু অদলবদল করে কতকগুলি বোমারু বিমান তৈরি করা হল যাদের নাম 'হেল ডাইভার'। সেসিলফিল্ডে ২৫০ খানা হেল ডাইভার ছিল। বারোখানা হেল ডাইভার বিমানের একটা স্কোয়াড্রন প্রতিদিন মাত্র ১০০ মাইল ব্যাসার্ধের মধ্যে দু ঘণ্টা ধরে মহড়া দিত।

দশখানা বিমানে থাকত ট্রেনী অর্থাৎ শিক্ষার্থীরা এবং দুখানা বিমানে থাকত ইনস্ট্রাক্টর অর্থাৎ শিক্ষকরা। প্রতি বিমানে থাকত দুজন, একজন পাইলট আর একজন বম্বার-রেডিওম্যান যার কাজ ছিল বোমা ফেলা এবং রেডিও অপারেটরের কাজ করা।

বিপদে জীবনরক্ষার জন্য পাইলটদের 'মে ওয়েস্ট' নামে গলায় ঝোলানো একরকম আবরণী পরতে হত, অনেকটা লাইফবেল্টের মতো, জলে পড়লে পাইলট ডুববে না। এ ছাড়া প্রতি প্লেনে থাকত রবার বোট। বোটে থাকত স্বয়ংক্রিয় এমন একটি রেডিও প্রেরক-যন্ত্র যা জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটি বিপদ সংকেত পাঠাতে পারত। আপৎকালীন রেশন ও ওষুধপত্তরও বোটে রাখা থাকত।

বিমান আকাশে ওঠবার আগে তাদের এঞ্জিন, যন্ত্রপাতি ও পেট্রল ট্র্যাংক ইত্যাদি উত্তমরূপে পরীক্ষা করা হত। সব কিছু ঠিকভাবে কাজ করছে কিনা, সরঞ্জামগুলি যথাস্থানে যথাযথভাবে রাখা আছে

কি না তাও দেখে নেওয়া হত। মিলিটারি ব্যাপার বলে কথা। বিমান আকাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ট্রোল টাওয়ারে রেডিওম্যান কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে সতর্ক থাকত।

একদিন বারোখানা বিমান মহড়া দেবার জন্যে যথারীতি আকাশে উঠল কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ফিরে এল দশখানা বিমান। দুখানা বিমান ফিরে এল না। তারা কোথায় গেল, তাদের কি হল কেউ জানে না।

যারা ফিরে এসেছিল তারা বলল আবহাওয়া তো ভালই ছিল, আকাশ পরিষ্কার ছিল, তারা কোনো অসুবিধেয় পড়ে নি, দৃষ্টিও বহু-দূর পর্যন্ত চলছিল। দুখানা বিমান থেকে বাকি বিমানের পাইলট বা নীচে কণ্ট্রোল টাওয়ার কোনো বিপদ সংকেত পায় নি।

সঙ্গে সঙ্গে সন্ধানী বিমান পাঠান হল। সমুদ্রের বুকে জাহাজ-গুলিকেও সতর্ক করা হল কিন্তু বিমান দুখানির কোনোই সন্ধান বা চিহ্ন পাওয়া গেল না। তারা যেন উবে গেছে। কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া গেল না।

তখন যুদ্ধের সময়। সামনে নানা সমস্যা। হারানো বিমান নিয়ে খোঁজাখুঁজি চলেছিল কিছুদিন কিন্তু তারপর বৃহত্তর স্বার্থে সব থেমে যায়।

যুদ্ধ থেমে গেল একদিন এবং বছরের শেষে ঘটল "গ্রেটেস্ট অ্যাভিয়েশন মিস্ট্রী অফ অল টাইম"।

১৯৪৫-এর ৫ ডিসেম্বর। ফ্লোরিডার আর একটি বিমানক্ষেত্র, নাম লডারডেল এয়ারস্টেশন। এখানেও পাইলটদের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নতুন টাইপের বিমান তৈরী হয়েছে, কোনোটা জঙ্গী, কোনোটা বোমারু। যুদ্ধ থেমে গেলেও উন্নতিসাধনের জন্যে আরও পরীক্ষার দরকার। অতএব ট্রেনিং-এর বিরতি হয় নি।

তবে লভারডেল এয়ারস্টেশনের পাইলট ট্রেনীরা কেউ অযোগ্য বা অনভিজ্ঞ নয়। তাদের প্রত্যেকের অন্তত ৩৫০ ঘণ্টা থেকে ৪০০

—যাবি না কি রে ?

—না ভাল লাগছে না, তাছাড়া শোন, এ মাসে আমার ফ্লাইট টাইম পুরো করে দিয়েছি, আমি না গেলে জোর করতে পারে না, তোরা যা, আমার আজ মেজাজ নেই, গেলে হয় তো ভুলভাল করে ফেলব, অ্যাকসিডেন্টই হয়ে যাবে হয় তো, তার চেয়ে···

দুই বন্ধু আর কিছু বলল না। তারা ততক্ষণে রেডি। সময়ও হয়ে এসেছে! ঠিক আছে, ওরা অফিসে জানিয়ে দেবে। যাবার আগে কসনারকে 'সোলং' বলে বিদায় জানিয়ে চলে গেল।

ওরা ঘর থেকে বেরোবার আগে কসনার ওদের তাড়াতাড়ি ফিরতে বলল, কথা আছে কিছু। তারপর কসনার বই নিয়ে বাংকে আবার শুয়ে পড়ল। বন্ধুরা যাবার সময় দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেল।

তাদের সঙ্গে কসনারের আর দেখা হয় নি। সেই শেষ বিদায়।

গ্যালিভান আর গ্রুবেল দুজনেই গানার। ওরা তাড়াতাড়ি অপারেশন বিল্ডিং-এর দিকে চলতে লাগল। ডিউটি শেষ করতে পারলে বাঁচে। কিন্তু তাড়াতাড়ি করলে কি হবে ? আগে গেলেই কি আগে প্লেন ছাড়বে ? তা তো নয়। সবই ঘড়ি ধরে নিয়মে বাঁধা, ঘড়ি ধরে কাজ হবে।

সেদিন গ্রুবেলের উৎসাহ যেন একটু বেশি। সেটা ঠিক। সেদিন বলে নয়, গ্রুবেল আকাশে উড়তে ভালবাসে। আকাশে উঠলে তার মনে প্রাণে যেন কিসের জোয়ার আসে।

গ্যালিভান ঠাট্টা করে বলল: কি রে ইয়ো ইয়ো খুব উড়তে শিখেছিস ? না ?

বন্ধুরা সবাই গ্রুবেলকে 'ইয়ো ইয়ো' বলে ডাকে। ছেলেরা হাতে একরকম কাঠের বা প্লাস্টিকের চ্যাপটা চাকার ভেতর সুতো বেঁধে ছুঁড়ে দেয়, আবার গুটিয়ে নেয়, সেইগুলোকে বলে ইয়ো ইয়ো আমাদের ছেলেমেয়েরা বলে হাত লাট্টু।

বন্ধুর মন্তব্য শুনে গ্রুবেল শুধু হাসল। সে সত্যিই আকাশে

উঠতে ভালবাসে। আকাশে উঠে সে মনে করে সে যেন স্বর্গের কাছে পৌঁছে গেছে কারণ মনে মনে সে একটু ধর্মপ্রবণ। তার ইচ্ছে এখানকার ট্রেনিং শেষ হলে সে বিমানবহরে চাকরি নেবে না। ডিভিনিটি স্কুলে ভর্তি হবে। সে পাদ্রী হবে।

গ্যালিভান তার ডিউটি করতে ভালবাসে। ডিউটিতে যাবার সময় থেকে আরম্ভ করে ফেরার সময় পর্যন্ত সে আর কিছু চিন্তা করে না। তার তিন বছর চাকরি হয়ে গেল। যুদ্ধের সময় সে প্যাসিফিক কমাণ্ডে ছিল। অপারেশন বিল্ডিং-এ যাবার পথে সে ভাবছে কসনারটা আজ এল না কেন? ওরা তো সবসময়ে তিনজনে ডিউটিতে যায়। আজ এরকম হল কেন? যাক গে আর তো কয়েকটা ঘণ্টা, তারপর বিকেল চারটেয় ফিরে এসে তিনজনে আবার জমানো যাবে। আজ যে নাটকটা অভিনীত হবে সেটা নাকি হাসির।

অপারেশন সেণ্টারে এসে ওরা দেখল বাকি সকলে এসে গেছে। কসনার অনুপস্থিত। তার জায়গায় অন্য লোক দেওয়া হল। লোক রিজার্ভ থাকে। শেষ মুহূর্তে কেউ তো অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে।

যাই হক ফ্লাইট নাম্বার নাইনটিনের দল তখন রেডি। তাদের নির্দেশ দিয়ে দেওয়া হল। অঙ্কের মতো সেই নির্দেশ, একটুও এদিক ওদিক নড় চড় হবার উপায় নেই।

বিমানের এঞ্জিন, অন্যান্য যন্ত্র, ফুয়েল, রেডিও পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। সব ঠিক আছে। ট্যাংকে যা ফুয়েল আছে তাতে হাজার মাইল ওড়া যাবে।

বেলা ঠিক ১টা ৩০ মিনিটে ওরা সকলে নিজ নিজ বিমানের সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ঠিক দুটোয় প্রথম বিমান টেক অফ করল। তারপর বাকি চারখানাও লডারডেল এয়ার স্টেশনের রানওয়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে আকাশে উঠল। একটু পরেই পাঁচখানা অ্যাভেঞ্জারকে সার বাঁধা পাখির মতো আকাশে উড়তে দেখা গেল।

পুব দিকে ওরা অ্যাটলান্টিক সাগরের দিকে যাচ্ছে। কোনো

এক জায়গায় একটা ভাঙা জাহাজ রাখা আছে। সেইটে ওদের লক্ষ্য। মহড়া দেবার জন্যে ওরা ছোঁ মেরে নিচে নেমে ভাঙা জাহাজের দিকে টর্পেডো বোমা ছুঁড়ে আবার আকাশে উঠল।

এইরকম কয়েকবার করার পর ফ্লাইট নাইনটিনের পাঁচখানা বিমান আবার আকাশে উঠে নিজেদের সাজিয়ে নিল। এবার ওরা কাল্পনিক ত্রিকোণ রচনা করে লডারডেল এয়ারবেসে ফিরে আসবে। সেদিন সেই অভিশপ্ত পাঁচখানা অ্যাভেঞ্জার বিমান সম্বন্ধে এই হল শেষ জ্ঞাত তথ্য।

এদিকে নিচে ব্যারাকে বসে অ্যালেন কসনার তার বাড়ির লোকেদের চিঠি লিখছে। তার বাড়ি হল উইসকিনসন স্টেটে কোনোসা শহরে। চিঠি লেখা শেষ করে খামে ভরে ঠিকানা লিখে খাম বন্ধ করে কব্জি ঘুরিয়ে ঘড়ি দেখল ৩-৪৫।

আর তো পনেরো মিনিট পরে গ্যালিভান আর গ্রুবেল ফিরে আসবে। কসনার যখন তার চিঠি শেষ করে ঘড়ি দেখছিল ঠিক সেই সময়ে লডারডেল কন্ট্রোল টাওয়ারের রেডিওম্যান ঘড়ি দেখছে। সামনেই বড় গোল ঘড়ি। টক টক করে চলছে, সেকেণ্ড পর্যন্ত নির্দেশ করে তৃতীয় একটা সরু কাঁটা এগিয়ে চলেছে।

আর পনেরো মিনিট বাকি আছে। চারটে বাজলেই তার ছুটি, অন্য লোক আসবে। শেষবারের মতো লগবুকখানা চেক করতে লাগল। বেশ নিশ্চিন্তমনে সে কাজ করছে। কোথাও কোনো গোলমাল নেই।

তার কানে ইয়ারফোন লাগানো আছে। সেটা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ছিল। সে যখন হাতে কলম নিয়ে লগবুক দেখছে ঠিক সেই সময়েই ব্যাকুল ও অনিশ্চিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল। সেই কণ্ঠস্বর বলছে—

কন্ট্রোল টাওয়ার দিস ইজ অ্যান এমারজেন্সি, আমাদের খুব বিপদ, মনে হচ্ছে আমরা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছি, আমরা মাটি দেখতে পাচ্ছি না ··আবার বলছি আমরা মাটি দেখতে পাচ্ছি না।

উই ক্যান নট সি ল্যাণ্ড···

কথাগুলো বললেন ১৯ নং ফ্লাইটের কমাণ্ডান্ট ছ বছরের অভিজ্ঞ বৈমানিক লেফটেনান্ট চার্লস টেলর।

কণ্ট্রোল টাওয়ার থেকে উদ্বিগ্ন রেডিওম্যান উত্তর দিল।

—তোমরা ঠিক কোথায় আছ? হোয়াট ইজ ইয়োর পজিসন?

—তাতো বলতে পারছি না, টেলর উত্তর দিল, আমরা হারিয়ে গেছি মনে হচ্ছে, ইট সিমস উই আর লস্ট।

কণ্ট্রোল টাওয়ারে আরও অপারেটর ছিল। তারা সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগল। এ কি করে হয়? আকাশে মেঘ নেই। কুয়াশা নেই, ঝড় নেই, ওড়বার পক্ষে আদর্শ আবহাওয়া, সবকটা মেসিন ভাল, পাইলটরা অভিজ্ঞ, বেশি দূরেও যায় নি, কি করে তারা পথ ভুল করতে পারে?

কণ্ট্রোল টাওয়ার বলল: পশ্চিম দিকে প্লেনের মুখ ঘোরাও। এই নির্দেশের জবাব শুনে কণ্ট্রোল টাওয়ার স্তম্ভিত।

—পশ্চিম কোন দিকে আমরা ঠিক করতে পারছি না··সব গোলমাল হয়ে গেছে··আশ্চর্য··কোনো দিকই আমরা ঠিক করতে পারছি না···সূর্যও দেখা যাচ্ছে না এমন কি নিচে ওটা সমুদ্র কি না তাও আমরা বুঝতে পারছি না···

টাওয়ারের সবাই রীতিমতো অবাক। পাইলট বলে কি?

টেলরের প্লেনের কম্পাস না হয় খারাপ হয়েছে কিন্তু আরও তো চারটে প্লেন আছে। তাদেরও কি কম্পাস বিকল হয়ে গেল নাকি? পশ্চিম কোন দিকে তা কেউ চোখে ধরতে পারছে না? এ পথ তো ওদের চেনা। এয়ারপোর্ট থেকে বেশি দূরেও যায় নি, সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লেও ডুবে তো যায় নি, এখনও তাকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। তবে?

এরপর কণ্ট্রোল শুনতে পেল পাঁচখানা প্লেন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। ওরা পরস্পরের প্লেন দেখতে পাচ্ছে কিন্তু সকলেই দিক্‌ভ্রান্ত।

তাদের কথাবার্তা শুনে টাওয়ারের অপারেটররা বেশ বুঝতে পারল যে পাইলটরা ভয় পেয়েছে।

লেফটেনান্ট টেলর নারভাস হয়ে পড়েছে। সে আর কমাণ্ড রাখতে পারল না। তার মাথা ঘুরছে। তখন চারটে বেজে গেছে। টেলর কমাণ্ড ছেড়ে দিল। মেরিন ক্যাপটেন জর্জ স্টিভার্স ভার নিল।

এই দুঃসংবাদ দ্রুত নিচে এয়ারস্টেশনে ছড়িয়ে পড়ল। সকলেই উদ্বিগ্ন। অ্যালেন কসনার চিঠিখানা ফেলে রেখে কন্ট্রোল টাওয়ারে ছুটে গেল। তখন চারটে বেজে পঁচিশ মিনিট।

জর্জ স্টিভার্স কথা বলছেঃ রেডিও বোধহয় বিকল হয়ে যাচ্ছে। শব্দ বা ধ্বনিবিস্তার খুব স্পষ্ট নয়, নিস্তেজ হয়ে আসছে তবুও বোঝা যাচ্ছে। স্টিভার্স বলছে।

—ঠিক বলতে পারছি না···বেস থেকে বোধহয় ২২৫ মাইল উত্তর পূর্বে উড়ছি·· মনে হচ্ছে আমরা ·

আর কিছু শোনা গেল না দাঁতে দাঁত চেপে কসনার কথাগুলো শুনল। গ্যালিভান এবং গ্রুবেল তো স্টিভার্সের প্লেনেই আছে। তারও তো এই ফ্লাইটে যাবার কথা ছিল? ওরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে?

বেতার যোগাযোগ হঠাৎ হারিয়ে গেল। যাকে বলে 'ডেড', তাই। কোনো কথা শোনাও যাচ্ছে না, বলাও যাচ্ছে না।

সকলে কান খাড়া করে আছে।

স্টিভার্সের শেষ কথা শোনা গেল। রেডিও হঠাৎ যেন ঈষৎ সরব হয়ে উঠল। অতি ক্ষীণ স্বর শোনা গেলঃ

আমরা কি জলে পড়ে যাচ্ছি? আমরা একেবারেই হারিয়ে গেছি, উই আর কমপ্লিটলি লস্ট।

সেই হল স্টিভার্সের শেষ কথা। তারপর ডেড সাইলেন্স। কোনো পাইলটের আর কোনো কথাই শোনা গেল না। টাওয়ার থেকে রেডিও অপারেটররা অনেক চেষ্টা করল কিন্তু বৃথা।

ফ্লাইট নম্বর নাইনটিন টেকঅফ করার পর দু ঘণ্টা সতেরো মিনিট কেটে গেছে। স্টিভার্সের পর আর কোনো আওয়াজ শোনা যায় নি।

ফোর্ট লডারডেলের উত্তরে ১৫০ মাইল দূরে আরও একটি এয়ার বেস আছে। এইটির নাম ব্যানানা রিভার নেভাল এয়ারস্টেশন। বর্তমানে নাম পালটে গেছে। এখন নাম প্যাট্রিক এয়ারফোর্স বেস।

পাঁচখানি নিরুদ্দিষ্ট অ্যাভেঞ্জার বিমানের সন্ধানে অবিলম্বে একটি উপযুক্ত বিমান পাঠান দরকার। সেই রকম বিমান এই ব্যানানা রিভার বেসে সর্বদা প্রস্তুত রাখা থাকে।

ইতিমধ্যে বেতার মারফত সমুদ্রে সমস্ত জাহাজ ও আকাশে উড়ন্ত বিমানগুলিকে খবরটা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অনুরোধ করা হয়েছে যে অ্যাভেঞ্জার বিমানগুলির কোনো খবব পেলে যে কোনো এয়ারবেসে যেন জানিয়ে দেওয়া হয়।

ওদিকে সমুদ্রের উপকূলে পাহারারত কোস্টগার্ডরা খবর পাওয়া মাত্র সারারাত্রি ধরে টহল দিয়ে বেড়াতে লাগল।

এদিকে সন্ধ্যা ৭টা ৫ মিনিটে বিভিন্ন কণ্ট্রোল টাওয়ারের রেডিও-তে একটি অসম্পূর্ণ সংকেত শোনা গেল। একটি অ্যাভেঞ্জার বিমান তার কেবল ধ্বনি সংকেতটুকু জানাচ্ছে, "এফ টি·· এফ টি "

ঐ দু'বার মাত্র। আর নয়। এফ টি সংকেতধ্বনি ১৯ নম্বর ফ্লাইটের অ্যাভেঞ্জার বিমানগুলি ছাড়া আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না। সেই রকমই নির্দেশ।

কিন্তু কোথা থেকে সেই সংকেতধ্বনি প্রেরিত হল? তার উৎস জানা গেল না।

জরুরী খবর পাওয়া মাত্র ব্যানানা রিভার এয়ারবেসে লেফটে-নাণ্ট হ্যারি দমকলের মতো দ্রুতবেগে বারোজন বৈমানিকসহ বিরাট মার্টিন মেরিনার পিবিএম নামে উড়ন্ত জাহাজ নিয়ে আকাশে উঠলেন।

যদি কোনো বিমান বা বৈমানিক সমুদ্রে পড়ে যায় তাহলে

তাদের উদ্ধারের জন্যে মার্টিন মেরিনার বিমান বিশেষভাবে তৈরি। এই বিমান অশান্ত সমুদ্রেও সহজে নামতে পারে এবং এমনভাবে তৈরি ও এমন সব ব্যবস্থা নেওয়া আছে যে আর যাই হক এই বিমান কিছুতেই জলে ডুববে না। বিমানগুলি নেহাত ছোট নয়। ডানার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মাপ হল ১২৪ ফুট।

এই বিমানে রবারের নৌকো আছে, অতি সহজেই জলে ভাসান যায়। ওয়াটরপ্রুফ এমন রেডি ট্রান্সমিটার আছে যে জলের সংস্পর্শে এলেই তা বিপদসূচক বার্তা পাঠাতে থাকবে। বিমানগুলিতে যে পরিমাণ তেল থাকে তার দ্বারা সে চব্বিশ ঘণ্টা আকাশে উড়তে পারে।

ফোর্ট লডারডেল কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে অ্যাভেঞ্জার বৈমানিক-দের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠান হল সাহায্য যাচ্ছে। কোনো উত্তর নেই। আশা নেই তবুও তো খোঁজ করতে হবে।

মার্টিন মেরিনার বিমান আকাশে উঠল। অ্যাভেঞ্জার বিমান শেষে যে স্থান থেকে বিপদ সংকেত পাঠিয়েছিল অনুমান করে সেই দিকেই বিমান ছুটে চলল। সেখানে কিছুই নেই। না থাকাই সম্ভব। বিস্তৃত অঞ্চল খুঁজে বেড়াল মার্টিন মেরিনার। শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে লেফটেনান্ট হ্যারি আকাশ, সমুদ্র, জমি সর্বত্র দেখতে লাগলেন কিন্তু কোথায় সেই অ্যাভেঞ্জার বিমান ?

মার্টিন মেরিনার মাঝে মাঝে বেতার মারফত তার নিজের অবস্থান জানাচ্ছে এবং বলে যাচ্ছে যে এখনও কিছু দেখা যায় নি।

তারপর ? তারপর রহস্যজনকভাবে মার্টিন মেরিনারও নিস্তব্ধ হয়ে গেল। রেডিও যোগাযোগ সম্পূর্ণ স্তব্ধ। মার্টিন মেরিনারও কোথায় হারিয়ে গেল।

মার্টিন মেরিনার আকাশ থেকেই কোথাও হারিয়ে গেছে, জলে পড়লে রেডিও সংকেত পাওয়া যেত এবং তাকে খুঁজে পাওয়া যেত। জল, স্থল, অন্তরীক্ষ কোথাও সে নেই।

অ্যাভেঞ্জার বিমান জলে পড়লে টুপ করে ডুবে যেতে পারে কিন্তু প্রাণ বাঁচাবার জন্যে উপকরণসহ রবারের নৌকো অ্যাভেঞ্জারে মজুত থাকে এবং বিপদের সময় সেগুলি কি করে ব্যবহার করতে হয় তা বৈমানিকদের উত্তমরূপে জানা আছে।

মেরিনারের কথা স্বতন্ত্র। সে জলে পড়লে কিছুতেই ডুববে না আর যদিও বা ডুবতে থাকে তাহলেও সে বেতার মারফত বিপদ সংকেত পাঠাতে পারবে। সে ব্যবস্থা মেরিনারে আছে। অ্যাভেঞ্জারের মতো সে জলে ডুবতে পারে না।

জলে ডুবল না, ডাঙাতেও তাকে পাওয়া গেল না তাহলে আকাশ তাকে খেয়েছে।

কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে রেডিও অপারেটররা নিরন্তর বার্তা পাঠিয়ে যাচ্ছে। কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এমন অসম্ভব ঘটনা কখনও ঘটে নি।

তিন বন্ধুর বাকি বন্ধু কসনার লডারডেল কন্ট্রোল টাওয়ারে মুখ শুকিয়ে চুপটি করে বসে আছে। এই তো মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে তার বন্ধু দু'জনই 'সো লং' বলে বিদায় নিয়ে গেল আর সেই সো লং এমন নিষ্ঠুরভাবে সত্য হল ?

পরদিন সকাল হতেই 'সলোমন' নামে এয়ারক্র্যাফট ক্যারিয়ার-কে সমুদ্রে পাঠান হল। সলোমনেব ডেক থেকে বিমানের পর বিমান আকাশে উঠে সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। কিন্তু কোথায় সেই মেরিনার ?

বাহামা থেকে ব্রিটেনের রয়েল এয়ার ফোরসের বিমান বহরও অনুসন্ধানে যোগ দিল, এছাড়া কোস্টগার্ড ও সমুদ্রে ভাসমান অন্যান্য জাহাজও ছিল।

ফ্লোরিডার বনজঙ্গল খুঁজে দেখবার জন্যেও বারোটি সার্চপার্টি পাঠান হল কিন্তু কোথায় কি ? মোট তিনশ' বিমান খুব নিচুতে নেমে তন্ন তন্ন করে জল আর ডাঙা খুঁজতে লাগল কিন্তু আশ্চর্যের

বিষয় যে একজন লোকও এক টুকরো খবরও দিতে পারল না।

একটি নেভাল বোর্ড অফ ইনকুয়ারী বসেছিল। তারা সম্ভাব্য সকল দিক থেকে ঘটনাটি বিচার করেছিলেন কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি।

বোর্ডের একজন মেম্বার স্বীকার করেছিলেন যে তাঁর ব্যক্তিগত অনুমান যে অ্যাভেঞ্জার ও মেরিনারকে গ্রহান্তরের জীব ধরে নিয়ে গেছে। আকাশে কোথাও একটা ফাঁদ আছে, সেই ফাঁদে একবার ঢুকলে আর বেরোন যায় না, কেউ ফিরতে পারে না সেই ফাঁদের ভেতর থেকে।

অ্যামেরিকার নিউ জার্সিতে একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান আছে। প্রতিষ্ঠানটির নাম সোসাইটি ফর দি ইনভেসটিগেশন অফ দি আন-এক্সপ্লেনড। সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা হলেন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী আইভান টি স্যাণ্ডারসন।

অ্যাটলান্টিক মহাসাগরে 'বারমুডা ট্র্যাঙ্গল' এবং প্রশান্ত মহাসাগরে 'ডেভিলস সি' এলাকা দুটি যেখান থেকে জাহাজ ও বিমান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যায় এইরকম এলাকা পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা তা খুঁজে দেখবার জন্যে স্যাণ্ডারসন সাহেব ও তাঁর সোসাইটি কাজে লেগে গেলেন। সোসাইটিতে খ্যাতনামা অনেক সামুদ্রিক বিশারদ, ভূগোলবিদ, ভূতাত্ত্বিক, আবহাওয়া বিশারদ, গাণিতিক এবং অন্যান্য বিদ্যায় সুপণ্ডিত গবেষক আছেন।

দীর্ঘ অনুসন্ধানের ফলে পৃথিবীতে মোট বারোটি রহস্যজনক এলাকার সন্ধ্যান পাওয়া গেল যেখান থেকে কোনো না কোনো সময়ে জাহাজ বা বিমান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়েছে।

বারোটি এলাকার মধ্যে দশটি এলাকা হল বিষুবরেখার উত্তরে ও দক্ষিণে, পাঁচটি পাঁচটি করে। উত্তরে পাঁচটি দক্ষিণে পাঁচটি। মজার ব্যাপার এই যে এই দশটি এলাকা পরস্পর থেকে সমান দূরত্বে

অবস্থিত, প্রত্যেকের মধ্যে তফাত হল ৭২ ডিগ্রি।

এই দশটি ক্ষেত্র ব্যতীত উত্তর মেরুতে একটি এবং দক্ষিণ মেরুতে একটি ক্ষেত্র নির্দিষ্ট হয়েছে।

ঐ দশটি ক্ষেত্রে ফ্লাইং সসারদের এবং ইউ-এফ-ও-দের বেশিবার দেখা গেছে। কিন্তু ব্যতিক্রম বোধহয় অ্যামেরিকার ক্যালিফো-রনিয়া এবং ইলংণ্ডের উইল্টশায়ার কাউন্টির সেই জায়গাটি যার নাম ওয়ারমিনিস্টার। এই দু'টি জায়গায় ফ্লাইংসসার বা সিগার অনেক-বার দেখা গেছে।

ওয়ারমিনিস্টারে আরও কয়েকটি ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। গভীর রাত্রে অধিবাসীরা মাঝে মাঝে আকাশে একটা শব্দ শুনেছে। পুলিস বলেছে ও কিছু নয়, হাজার হাজার বক সার বেঁধে উড়ে যাচ্ছে এ তারই শব্দ। কিন্তু বক কোথায়? বকের সারি কেউ দেখতে পায় নি।

তারপর সেই সাংবাদিক সাটলউড, যে ফ্লাইং সসারের ফটো তোলবার সময় প্রথমে হাতে ব্যথা অনুভব করেছিল এবং পরে তার চোখ আক্রান্ত হয়েছিল, চোখ দিয়ে জল পড়ছিল এবং অন্যান্য অসুবিধাও দেখা দিয়েছিল।

আর একজন মহিলা যিনি বলেছিলেন যে গির্জায় যাবার সময় তাঁর দেহে যেন ইলেকট্রিক শ্যক লেগেছিল এবং সেই শ্যক যেন আকাশ থেকে নেমে এসেছিল।

আর কলেট নামে সেই মোটর-আরোহী যে একটি অস্পষ্ট ইউ-এফ-ও দেখেছিল তার গাড়ির সামনে। তার গাড়ির এঞ্জিন ও ব্যাটারি নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছিল এবং তার কোনো কোনো অঙ্গ যেন অবশ হয়ে গিয়েছিল।

দৈহিক এই সকল অসুবিধার কোনো ব্যাথা খুঁজে পাওয়া যায় নি।

ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল বেশ কয়েক বছর পরে এবং তার

সঙ্গে জড়িত ঘটনা 'বিশ্বাস কর আর না কর' পর্যায়ে পড়ে।

কিন্তু যে ঘটনা ঘটেছিল তা কি উড়িয়ে দেওয়া যায়? তবে এই ঘটনার সঙ্গে অ্যাডামস্কি জড়িত ছিল না, জড়িত ছিল একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী যার নাম ডক্টর রিচার্ড গোভার।

ইংলণ্ডের চেলসি শহর।

হেলেন মার্টিন সুন্দরী যুবতী, বয়স তিরিশ, সোনালী চুল, টানা টানা নীল চোখ, ভেনাসের মতো দেহ: সিনেমা দেখছিল। ম্যাটিনি শো। হাসির ছবি।

একটা মজার গান শুনতে শুনতে হলের সকলেই হাসছিল, বেদম হাসি, হল বুঝি ফেটে পড়বে। হেলেনও হাসছিল। কিন্তু হঠাৎ মাথার ভেতরে সেই কিলিবিলি, শরীরটা ঝিম ঝিম করতে লাগল।

হেলেনের হাসি থেমে গেল, হাসির গানটা জোলো মনে হল। ব্যাগ খুলে কী একটা ট্যাবলেট মুখে দিল। পাঁচ মিনিট কেটে গেল কিন্তু আরাম পাওয়া গেল না।

হলে আর বসে থাকা গেল না। হেলেন হল থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে তার গাড়ি ছিল। বাইরে এসেও মাথা পরিষ্কার হল না।

এরকম তার মাঝে মাঝে হচ্ছে। ব্লাড প্রেসারের কোনো ব্যাপার নয়, চোখেরও কোনো গোলমাল নয়। কেন এরকম হয় কোনো ডাক্তার ধরতে পারে নি।

ধরতে পেরেছে তার কাকা। কাকার নাম বিল সারফেস। কাকা তার বন্ধুর মতো। বয়সে কিছু বড়। হেলেন তাকে বিল বলেই ডাকে। বিল একজন টেস্ট পাইলট।

বিল তার সন্দেহের কথা প্রথমে হেলেনকে বলেছিল। হেলেন তখন বিশ্বাস করে নি। কিন্তু বিল বলেছিল এই ধরনের কেস ইংলণ্ডে আরও দেখা গেছে কিন্তু সরকারী নির্দেশে সংবাদপত্রে খবর ছাপা

হচ্ছে না। সরকার চায় না একটা ভীতির সঞ্চার হক।

হেলেন মার্টিন সিনেমা থেকে বাড়ি ফিরে এল। শোবার ঘরে ঢুকে গায়ের কোট খুলে শোফায় চুপ করে চোখ বুজে বসে মাঝে মাঝে কপালে মেন্থল স্টিক ঘসতে লাগল। কপাল ঠাণ্ডা হল কিন্তু মাথার ভেতরে সেই কিলিবিলি থামল না। আজ কতক্ষণ থাকবে কে জানে।

বিল সারফেসকে টেলিফোন করল, বিল মাথার মধ্যে আবার সেই কিলিবিলি, আধঘণ্টা হতে চলল এখনও তো কমল না, অনেক ছোট ছোট পোকা যেন মাথার ভেতর ঢুকে পড়েছে।

—আমার বাড়িতে আসতে পারবে? বিল জিজ্ঞাসা করল।

—পারব কিন্তু একটু হুইস্কি খেতে পারি?

— বেশ হুইস্কিটুকু খেয়ে চলে এস।

ঠাণ্ডা জলে কিছু হুইস্কি ঢেলে একটা সিগারেট ধরিয়ে হেলেন আস্তে আস্তে হুইস্কিটুকু শেষ করে নিজের গাড়িতে চড়ে বিলের ফ্ল্যাটে এল।

ডোর বেল বাজাতেই বিল নিজে দরজা খুলে দিয়ে বলল—

—একটা জরুরী টেলিফোন আসবার কথা ছিল তাই আমি নিজে তোমার ফ্ল্যাটে যেতে পারলুম না। যাক তুমি ভালয় ভালয় পৌঁছে গেছ, তোমাকে আসতে বলে আমার চিন্তা হচ্ছিল।

—আরে চলাফেরা করতে তো অসুবিধে হয় না, কোনো কাজে মন সংযোগ করতে পারি না তা তোমার জরুরী ফোন এসেছে?

—হ্যাঁ, সবে রিসিভার নামিয়েছি আর তোমার ডোর বেল বাজল। তুমি ঐ শোফায় শুয়ে পড়, ইঞ্জেকশনটা দিয়ে দি।

হেলেনের গায়ে স্লিভলেস ফ্রক। বিল হাইপোডার্মিক নিডল বার করে অ্যামপুল ভেঙে কি ওষুধ ভরল তারপর হেলেনের কোমল শুভ্র বাহুতে রেকটিফায়েড স্পিরিট ঘসে ছুঁচ ফুটিয়ে দিল।

ইঞ্জেকশন পর্ব শেষ হতে হেলেন জিজ্ঞাসা করলঃ এই কেস কি

আরও বাড়ছে।

—কারখানার কর্মীদের মধ্যেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে, উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, অথচ কিছু করবার নেই, সরকার রীতিমতো চিন্তিত। এরকম আর কিছুদিন চললে সব অচল হয়ে যাবে।

—এরকম কেস কি শুধু ইংলণ্ডেই দেখা যাচ্ছে না আর কোথাও দেখা দিয়েছে।

—হ্যাঁ, পেরুতে অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের অধিবাসীদের মধ্যে মাথার এইরকম রোগ দেখা যাচ্ছে।

—ওধারে কি ফ্লাইংসসার দেখা যাচ্ছে?

—দেখা যাচ্ছে, পাহাড়ের মাথায় নাকি মাঝে মাঝে ফ্লাইং সসার নামে। একদিন একজন চাষী তার ছোট ঘোড়ায় চেপে বাড়ি ফিরছিল। পাহাড়ী রাস্তায় বাঁক নেবার পর সে দূরে একটা ফ্লাইং সসার দেখেছিল। শতখানেক গজ যাবার পর তার ঘোড়া হঠাৎ থেমে যায়। তার ঘোড়া তো এমন থামে না। কি ব্যাপার? ঘোড়া যেন কিসের গন্ধ পেয়েছে? সেই পেরুভিয়ান চাষী তখন তার ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। খুঁজতে খুঁজতে একটা সমতল ভূমিতে সে বেশ খানিকটা হলদে রঙের চটচটে পদার্থ দেখতে পায়।

—কোনো রকম রাসায়নিক পদার্থ বুঝি? হেলেন প্রশ্ন করে।

—ঠিক তাই কিন্তু আমাদের কোনো ল্যাবরেটরি এখনও পর্যন্ত সেই পদার্থটি অ্যানালিসিস করতে পারে নি, আমাদের পৃথিবীতে যেসব রসায়ন আছে তার অনেকগুলির গুণের সঙ্গে খানিকটা মেলে তবে সম্পূর্ণ নয় তবে পদার্থটি ভীষণ দাহ্য, পেট্রলের মতো দ্রুত আগুন ধরে যায় এবং এক চামচে পদার্থ শেষ হতে এক ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে।

—তাহলে বিল ঐ পদার্থ হল ফ্লাইং সসারের ফুয়েল।

—হ্যাঁ, ঐ ফুয়েল খানিকটা সংগ্রহ করে একটা মডেল জেট প্লেন ওড়াবার চেষ্টা করা হয়েছিল, চেষ্টা আংশিক সফল হয়েছিল,

সম্পূর্ণ সফল হয় নি কারণ আমাদের জেট প্লেনের কলকজাগুলি সেই ফুয়েলের উপযুক্ত নয়।

—তাহলে তো বলি তোমরা যদি সেই রকম একটা ফুয়েল তৈরি করতে পার তো তাহলে অল্প পরিমাণ ফুয়েলেই তোমাদের স্পেস-শিপগুলি চালানো যাবে।

—তা হয় তো যাবে কিন্তু সেই ফুয়েলের যে মৌলিক পদার্থ তা হয় তো আমাদের পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

—এই খবরটাও তাহলে গোপন রাখা হয়েছে।

—হ্যাঁ, তবে ঐ পেরুভিয়ান চাষী ফ্লাইং সসার দেখবার পর আরও কয়েকটা সসার ঐ অঞ্চলে যখন দেখা গেল তখন পেরুভিয়ান সরকারের অনুমতি নিয়ে ইংলণ্ড ও অ্যামেরিকার যৌথ প্রচেষ্টায় ওখানে একটি অবজারভেসন পোস্ট বসানো হয়েছে, নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রজেক্ট ডায়না'।

—প্রজেক্ট ডায়না, বাঃ বেশ নাম তো, ওটা যে একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাপার কেউ বুঝতে পারবে না, যাক গে তোমাদের কর্তারা কি করছেন, মাথার এই কিলিবিলি থামাবার কিছু চেষ্টা করছেন কি ?

—চেষ্টা তো করছেন কিন্তু কতদূর যে কি করতে পারবেন বোঝা যাচ্ছে না, কারণ···

—কি চুপ করলে যে ? বল।

—বলছি, হেলেন কিন্তু ব্যাপারটা টপ সিক্রেট, আমাদের ব্যুরো-অফ ইংলিস স্পেস কমিউনিকেশনস সংক্ষেপে বি ই এস সি সন্দেহ করছে যে ভিন্ন কোনো গ্রহের বুদ্ধিমান জীবেরা পৃথিবীকে লক্ষ্য করে বিশেষ একটি মাপের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠাচ্ছে যার ফলে মানুষের মাথার মধ্যে কিলিবিলি হচ্ছে।

—তাই যদি হয় তাহলে সব মানুষের মাথার মধ্যে-কিলিবিলি হচ্ছে না কেন ?

—ভাল প্রশ্ন করেছ, যে মাপের তরঙ্গ তারা পাঠাচ্ছে তা সব

মানুষকে প্রভাবিত করছে না।

—তাহলে ওরা যদি এমন মাপের তরঙ্গ পাঠাতে পারে যা সব মানুষ এমন কি পশুপক্ষীকেও প্রভাবিত করতে পারবে তখন তো আমাদের ভীষণ বিপদ হবে, মানব সভ্যতা ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

—সেইজন্যেই তো বি ই এস সি-এর চিফ, ডক্টর হিউ নিউবেরি ঐ তরঙ্গের উৎস সন্ধানের চেষ্টা করছেন, উৎস নাকি জানতে পেরেছেন, এবার চেষ্টা করবেন সেই উৎস লক্ষ্য করে পাল্টা তরঙ্গ পাঠাতে।

—তার মানে দুই গ্রহের মধ্যে যুদ্ধ কিন্তু বিল আমার তো মনে হচ্ছে সেই গ্রহের জীবেরা মানুষের চেয়েও বুদ্ধিমান এবং কারিগরি বিদ্যায় আমাদের চেয়েও অনেক বেশি অগ্রসর!

—তা হতে পারে।

—তোমরা হয় তো পাল্টা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ পাঠালে আর ওরা হয় তো এমন জীবাণু পৃথিবীর ওপর ছাড়তে লাগল যে জীবাণু ধ্বংস করবার কোনো অস্ত্র আমাদের জানা নেই কিংবা হয় তো ওরা রেডিও অ্যাক্টিভ তরঙ্গ পাঠাতে আরম্ভ করল যার ফলে একদিন দেখা গেল যে সারা পৃথিবীর সমস্ত ধান ও গম গাছ ধ্বংস হয়ে গেছে।

—তবে ওদের গ্রহে রেডিয়াম, বা ইউরেনিয়ম ইত্যাদি তেজস্ক্রিয় ধাতু নাও থাকতে পারে, জীবাণুও হয় তো নেই, সেসব পরের কথা তবে আমাদের সরকার খুবই চিন্তিত। স্পেস কমিউনিকেশন-এর ডক্টর রিচার্ড গোভারকে ভার দেওয়া হয়েছে।

—ডক্টর গোভার? তিনি তো নিউরো-ফিজিওলজিস্ট মানে যাকে তোমরা বল নিউরোফিল, তিনি তো নার্ভের ডাক্তার, তিনি কি করবেন?

—আরে ডক্টর গোভার কি নয়? সে শুধু নিউরোফিল নয়, তার তুল্য প্রতিভাশালী বিজ্ঞানী বোধহয় দ্বিতীয় জন নেই, মাথার এই যে কিলিবিলি? ডঃ গোভার তার নাম দিয়েছেন 'ইমপালসেসিয়া'।

—ইমপালসেসিয়া ?

—হ্যাঁ, ডঃ গোভার যদি সরকারি বাধা না পেতেন এবং তাঁকে আর কিছু পাউণ্ড দেওয়া হোত তাহলে মহাকাশ-গবেষণায় আমরা আমেরিকা ও রাশিয়াকে অনেক আগেই ছাড়িয়ে যেতুম চাই কি অ্যামেরিকার আগেই আমরা চাঁদে নামতে পারতুম, ডঃ গোভার এ কথা নিজে বলেছেন।

—তবুও তো যথোপযুক্ত সরকারি সাহায্য ছাড়াই তিনি অসাধ্য সাধন করছেন, ব্রিটেনের চাঁদে যাবার কোনো প্ল্যান আছে নাকি ?

—জানি না তবে তুমি ভাল কথা মনে করিয়ে দিয়েছে তো ? দাঁড়াও, স্পেশাল সিকিউরিটির কর্ণেল জ্যাকসনকে একটা ফোন করি।

বিল সারফেস টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালো। কর্ণেল জ্যাকসনের টেলিফোন বাজল কিন্তু তারপরই গ্রামোফোন রেকর্ডের মতো কে যেন একনাগাড়ে বলে যেতে লাগল ঃ কর্ণেল জ্যাকসন এখন খুব ব্যস্ত, কথা বলতে পারবেন না···কর্ণেল জ্যাকসন এখন···

বিল বিরক্ত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে তারপর আবার রিসিভার তুলে অন্য একটা নম্বর ডায়াল করল। এ নম্বরটা কর্ণেলের ফ্ল্যাটের নম্বর।

দু তিনবার রিং হবার পরই কর্ণেলের পরিচিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—হ্যালো কে কথা বলছ।

—অফিস পালিয়ে বাড়িতে বসে আছ বুঝি।

—কে ? বিল নাকি ? আরে বল কেন ভাই, আমরা সিকিউ-রিটির লোক, আমাদের নানারকম ঝামেলা, আফ্রিকা থেকে কাল অনেক রাত্রে একটা ডেলিগেশান এসেছে, তাদের তদারক করতে করতেই রাত্রি কাবার, ভোরে বাড়ি ফিরে ঘুমোবার মতলব করছিলুম তারপরই একটা জরুরী কল পেয়ে লণ্ডন ছুটতে হল, এই তো দুপুরে

ফিরেছি, তারপর একটা লম্বা ঘুম দিয়ে উঠলুম আর তোমার ফোন এল।

—থ্যাংক গড যে তোমাকে ঘুম থেকে তুলতে হয় নি। যাক যে জন্যে ফোন করছি, আউটসাইড স্টাফ অর্থাৎ বহির্জগতের অতিথিদের কিছু খবর বল।

সিকিউরিটি মহলে ফ্লাইং সসার বা ইউ-এফ-ও আউটসাইড স্টাফ বা সংক্ষেপে 'ও এস' নামে পরিচিত।

—আমি অবিশ্যি দেখিনি তবে আমাদের রাডার স্ক্রীনে মাঝে মাঝে দু চারটে ধরা পড়েছে, কর্ণেল বলল।

—আর ইমপালসেসিয়া ?

—আর বল কেন ভাই, সপ্তাহে দুটো একটা করে পেসেন্ট বাড়ছে, এই রকম চলতে থাকলে ভাল কথা হেলেন কেমন আছে ?

—একই রকম, ইঞ্জেকশন দিলে ভাল থাকে তাও দু একদিন মাত্র, ওর সঙ্গে কথা বলবে ?

—ও যদি কথা বলতে চায় তো দাও।

হেলেন ফোন ধরল। কর্ণেল জ্যাকসন তার কুশল খবর জিজ্ঞাসা করল তারপব পরামর্শ দিল।

—তুমি একদিন ডক্টর গোভারের সঙ্গে দেখা কর।

—ভাল বলেছ তো, বেশ, আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলি।

—এইরে আবার কে ডাকছে, এক্সকিউজ মি হেলেন, আমি ফোন ছাড়ছি, বাই।

কর্ণেল জ্যাকসন ফোন ছেড়ে দিল। হেলেন একটু গুছিয়ে শোফায় বসল। বিল সারফেস জিজ্ঞাসা করলঃ কর্ণেল কি বলছিল ?

—কর্ণেল বলছিল ডক্টর গোভারের সঙ্গে দেখা করতে।

—আমিও ক'দিন ধরে তাই ভাবছিলুম তোমাকে একবার ডক্টরের কাছে নিয়ে গেলে হয়, তা তিনি তো থাকেন সলসবেরিতে,

সেখানেই আমাদের বি ই এস সি আর ওরই এক অংশে ডক্টরকে বিরাট ল্যাবরেটরি তৈরি করে দেওয়া হয়েছে, ডক্টর বোধহয় কি একটা স্পেস মেডিসিন নিয়ে রিসার্চ করছেন।

—তাহলে তো আমার মতো গিনিপিগের তার দরকার আছে, হেলেন বলল, একটা তারিখ ও সময় ঠিক কর না, ফোনে তাঁকে পাওয়া যাবে? তোমাকে চেনেন?

—চেনেন বই কি তাছাড়া ডক্টরের যে সেক্রেটারি, টেড মিলার, তাকে তো তুমি চেনো, অ্যামেরিকান? মনে পড়ছে?

—খুব চিনি, উঃ কি ভীষণ খাটতে পারে আর কত কি জানে, বেশ তো টেডকেই ফোন করে ডক্টরের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট কর।

—তাই করব, টেড আমাকে একদিন বলেছিল যে পৃথিবী আর শুক্র গ্রহের মধ্যে ইথিরিয়া নামে ছোট একটি গ্রহ আছে সেই গ্রহ থেকেই নাকি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক তরঙ্গ এসে পৃথিবীতে ইমপাল-সেসিয়া ব্যারামাটি ছড়িয়ে দিচ্ছে। ডক্টর গোভার তাই বিশ্বাস করেন।

হেলেন হাই তুলল, বড্ড ঘুম পাচ্ছে।

—দেখেছ, আমি ভুলেই গেছি, বলতে বলতে বিল কিচেনের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল: শারলি তুমি করছ কি? হেলেনকে কফি আর স্যাণ্ডউইচ দাও, কফিতে ক্রীম একটু বেশি দিয়ো, হেলেন ক্রীম ভালবাসে।

কফি পান করেও ঘুম আটকাল না। হেলেন সেই শোফাতেই ঘুমিয়ে পড়ল।

বিল বুঝল এটা ইন্‌জেকশনের প্রতিক্রিয়া। কিছুক্ষণ ঘুমোক। দেখা যাক এই সুযোগে টেড মিলারকে পাওয়া যায় কি না।

বেশ কয়েকবার চেষ্টার পর টেডকে পাওয়া গেল। টেড বলল ডক্টর এখন খুব ব্যস্ত, একটা ক্যালকুলেশন নিয়ে খুব খাটছেন, পশু'র আগে দেখা হচ্ছে না, সেদিন লাঞ্চের পর তোমরা আসতে পার।

ব্যুরো অফ ইংলিস স্পেস কমিউনিকেশন বিল্ডিং-এর সামনে এসে গাড়ি থামল। সামনে লোহার নীরেট গেট। গেটের গায়ে নির্দেশাবলী লেখা ছিল। গেটের পাশে ছোট একটা ঘর থেকে লাইট মেসিন গান হাতে, ইউনিফরম পরা, মাথায় হেলমেট, দুজন গার্ড এগিয়ে এসে আইডেনটিটি কার্ড দেখতে চাইল।

বিল সারফেস তার ও হেলেনের আইডেনটিটি কার্ড বার করে দেখিয়ে বলল—

—ডক্টর নিউবেরির সঙ্গে আমাদের দেখা করার কথা আছে, তোমরা তাঁর সেক্রেটারি টেড মিলারকে ফোন কর।

একজন গার্ড দাঁড়িয়ে রইল, একজন ফোন করতে গেল। ফোন করে ফিরে এসে সে গেট খুলে দিল।

গেটের পর বাগান তারপর বিল্ডিং। আসল বিল্ডিংটা বারো তলা, তারপর ছোটখাট আরও কয়েকটা বিল্ডিং এবং ফ্যাকটরি রয়েছে।

মাঝে মাঝে সুন্দর বাগান। চারদিক উঁচু পাঁচিল ঘেরা। বাইরে থেকে কিছু বোঝা যায় না ভেতরে কি আছে।

একতলায় ওদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। সিকিউরিটি গার্ড ওদের বসতে বলে টেড মিলারকে আবার খবর দিল। ইতিমধ্যে সেই গার্ড একটা খাতা বার করে বিল সারফেস এবং হেলেন মার্টিনের নাম, ঠিকানা, বয়স, উচ্চতা, চোখ ও গায়ের রং চুলের রং ইত্যাদি লিখে নিয়ে তাদের টিপসই নিল।

এইসব তথ্য লেখা শেষ হলে তাদের দিয়ে ঐ খাতাতেই লিখিয়ে নিল যে তারা এখানে যা বলবে শুনবে বা দেখবে তা বাইরে কাউকে বলবে না। লেখার নীচে তাদের দিয়ে সই করিয়ে নিল।

এইসব লেখালেখি হতে হতে টেড মিলার নীচে নেমে এসেছিল। ওদের কাজ মেটাবার পর টেড ওদের নিয়ে লিফটে করে বারো তলায় উঠল। তারপর ওদের নিয়ে ঢুকল ডক্টর গোভারের ল্যাবরেটরিতে।

ডক্টর গোভারকে দেখে মনে হবে কোনো রাষ্ট্রদূত। দীর্ঘ, স্বাস্থ্য-বান, বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। বয়স বোধহয় পঞ্চাশ হবে। মাথার চুল সযত্নে আঁচড়ানো। আর পাঁচজন বিজ্ঞান তপস্বীর মতো তাঁকে দেখতে নয়।

ওরা ঘরে ঢুকতেই তিনি বললেনঃ টেড তুমি বিল ও মিস মার্টিনকে একটু বসাও, আমি এখনি আসছি।

হেলেন ভেবেছিল যে সে একজন বৃদ্ধ রুগ্ন পক্ককেশ অন্যমনস্ক এলোমেলো ভোলানাথ সদৃশ একজন প্রফেসরকে দেখবে কিন্তু ইনি তো দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত স্মার্ট, ক্ষিপ্র এবং সচেতন।

টেড ওদের নিয়ে গিয়ে ল্যাবরেটরির এক প্রান্তে টুলের ওপর বসালো। ল্যাবরেটরিতে একটাও চেয়ার নেই, সব টুল এমন কি ডক্টর গোভারও টুলে বসে রয়েছেন।

ল্যাবরেটরিতে আসবার আগে ডক্টর গোভার পনেরো মিনিট যোগ ব্যায়াম করেন, বিবিসি-এর খবর শোনেন, খবরের কাগজ পড়েন, পুরো ব্রেকফাস্ট খান, তারপর ল্যাবরেটরিতে আসেন। প্রত্যহ বিকেলে এক ঘণ্টা টেনিস খেলেন। রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে রেডিওতে বা স্টিরিওফোনে এক ঘণ্টা সঙ্গীত শোনেন। তাঁর প্রতি কাজ নিয়মে বাঁধা।

মাতৃভাষা ছাড়া ফরাসি, জার্মান ও সংস্কৃত জানেন। পৃথিবীর নানা বিষয় ও ব্যক্তি সম্বন্ধে খোঁজ রাখেন। স্মরণশক্তি অত্যন্ত প্রখর।

বিল ও হেলেন ল্যাবরেটরিতে যখন ঢুকল তখন ডক্টর গোভার কি একটা যন্ত্রের সামনে বসে কাজ করছিলেন। একদিকে ক্ষুদে লাল একটা সবুজ আলো জ্বলছিল আর যন্ত্রের মাঝখানে কতকগুলো ক্ষুদে লাল আলো এমনভাবে জ্বলছিল আর নিবছিল যেন একদল ক্ষুদে লাল আলো ব্যস্ত হয়ে যন্ত্রের এদিক থেকে ওদিকে আনা-গোনা করছে। সেই আলো লক্ষ্য করে ডক্টর গোভার পেনসিল

দিয়ে প্যাডে কি সব নোট করছেন।

টেড বলল যন্ত্রটা একটা মিনি কমপিউটর। এই রকম কমপিউটর ঐ একটাই আছে। নিজের কাজের সুবিধের জন্যে ডক্টর ওটা নিজেই তৈরি করেছেন, বড় কমপিউটরের সমস্ত গুণ ওতে আছে।

শুধু ঐ মিনি কমপিউটর কেন ? ডক্টর গোভার আরও অনেক যন্ত্র তৈরি করেছেন তার মধ্যে দুটো তো ওঁর টেবিলে দেখা যাচ্ছে একটার তিনি নাম দিয়েছেন নিউটন আর অপরটার নাম দিয়েছেন মাইমোজা।

—নাম শুনে তো যন্ত্র দুটোর কাজ কিছু বোঝা যাচ্ছে না ; ও দুটোর কাজ কি ? টেড মিলার জিজ্ঞাসা করল।

—বলছি, প্রথম যন্ত্রটার ডক্টর আগে নাম দিয়েছিলেন ই. (টি.) বি এবং দ্বিতীয়টার নাম দিয়েছিলেন ভাইব্রোস্কোপ পরে মহাবিজ্ঞানী নিউটনের স্মরণে ও দ্বিতীয় যন্ত্র যেটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর সেটিরও নাম পালটে দেন।

—বাঃ বেশ ইণ্টারেস্টিং তো, হেলেন বলল, নিউটন যন্ত্রটা বুঝি ক্যালকুলেটর ?

—মোটেই না, এটা একটা আশ্চর্য যন্ত্র, বিস্ময়কর আবিষ্কার, কোনো ব্যক্তির ভাষা না জানলেও এই যন্ত্রের সাহায্যে সেই ভাষা বোঝা যাবে। মনে কর আমি ইটালিয়ান ভাষা জানি না কিন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে ইটালিয়ান ভাষায় কথা বল তাহলে সেই ভাষার শব্দতরঙ্গ সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজি ভাষার শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়ে ইংরেজি লিপিতে তা একটি পর্দায় প্রতিফলিত হবে।

—অদ্ভুত তো !

—নিশ্চয়, ডক্টর বলছেন যে ভাষা আমরা শুনি নি সে ভাষাও এই যন্ত্র সাহায্যে বোঝা যাবে, তিনি বলেছেন যে ইমপালসোসিয়ার একটা সমাধান হলেই তিনি নিউটন যন্ত্রের উন্নতিসাধন করবেন, পশু পাখির যদি কোনো ভাষা থাকে তাহলে তারও ব্যাখ্যা এই যন্ত্রের

সাহায্যে করা যাবে।

—তাহলে তো পৃথিবী থেকে ভাষার বাধা ক্রমশঃ দূর হয়ে যাবে, পশুপাখির অনেক সমস্যাও মিটবে, আর অপর যন্ত্রটা ?

—ওটার সাহায্যে মহাশূন্যের নানারকম কম্পন, হাই ফ্রিকোয়েন্সি, আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি ইত্যাদি বেতার তরঙ্গের প্রকৃতি, মানুষের মস্তিষ্কের কম্পনের গতিপ্রকৃতি এবং সেই গতি প্রকৃতি দ্বারা সেই মানুষ তখন সেই মুহূর্তে কি ধরনের চিন্তা করছে, সু না কু, এসব ধরা পড়ে।

—এবার নামকরণের অর্থ বুঝলুম, মাইমোজা অর্থাৎ লজ্জাবতী লতা হল অত্যন্ত স্পর্শকাতর গাছ, ডক্টরের ঐ ভাইব্রোস্কোপ যন্ত্রটিও স্পর্শকাতর তাই তিনি ঐ নামকরণ করেছেন, তাই তো ?

—ঠিক তাই।

ওদিকে ডক্টর গোভার তাঁর কাজ শেষ করেছেন। টুল থেকে উঠে এসে ওদের সামনে এসে বললেন ঃ এখানে নয়, আমার অফিস ঘরে চল।

অফিস ঘরটি বেশ বড় এবং সেটিও একটি ক্ষুদে ল্যাবরেটরি। বুককেস ভর্তি বই, টেবিল ভর্তি সায়েন্টিফিক জর্নাল। সবই বেশ গোছানো, পরিষ্কার। এলোমেলো ভাব কোথাও নেই।

এ ঘরে বসবার জন্যে ফোম রবারের চেয়ার আছে। ডঃ গোভারের সামনে টেড, বিল ও হেলেন বসল।

টেড বলল ঃ ডক্টর আপনি তো টেড মিলারকে চেনেন কিন্তু মিস হেলেনকে তো চেনেন না, অবিশ্যি ওর নামটা আপনাকে আমি বলেছি। হেলেন হল বিলের ভাইঝি।

—মনে পড়েছে, ইমপালসেসিয়ার পেশেন্ট। আমি যে কজনকে পরীক্ষা করেছি তারা সবাই পুরুষ, কোনো মহিলা এ পর্যন্ত আমার কাছে আসে নি, মিস হেলেন তুমি একবার উঠে এসে এই টুলটায় বোসো তো।

হেলেন উঠে গিয়ে সেই টুলে বসল। গোভার জিজ্ঞাস করলেন—

—মাথার মধ্যে এখন কি কিলিবিলি করছে যেন অশ্রুত আওয়াজ হচ্ছে, কি মনে হচ্ছে—

—মনে হচ্ছে অনেক লোক যেন কথা বলছে অথচ তাদের কণ্ঠস্বর আমি শুনতে পাচ্ছি না।

—আচ্ছা আমি একটু দেখে নি।

ডক্টর গোভার উঠে একটা ক্যাবিনেট খুলে মাথায় পরবার করোনেটের মতো কি একটা বার করলেন। সেইটা হেলেনের মাথায় পরিয়ে দিলেন তারপর করোনেটের সঙ্গে তাঁর সেই মাইমোজা যন্ত্রটির সঙ্গে দুই রঙের দুটি সরু তার দিয়ে যুক্ত করে একটা চাবি টিপে মাইমোজা যন্ত্রে কি দেখলেন।

হেলেন নিশ্চল হয়ে বসে আছে।

মাইমোজা যন্ত্রের সঙ্গে তারের সংযোগ খুলে নিয়ে সেটি তুলে রাখলেন তারপর হেলেনের মাথা থেকে করোনেটটি তুলে নিয়ে তার গায়ে কি সব নাড়াচাড়া করে সেটি আবার হেলেনের মাথায় পরিয়ে দিলেন।

করোনেটটি পরিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে হেলেনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। ডক্টর গোভার কিছু জিজ্ঞাসা করবার আগেই হেলেন বলল—

—ডক্টর আমার ইমপালসেসিয়া ভ্যানিশ হয়ে গেছে, আমি আমার মাথার ভেতরে আর কিছুই অনুভব করছি না।

—তাহলে আমার যন্ত্রটা ঠিক কাজ করছে কিন্তু মিস হেলেন আমি দুঃখিত, করোনেটটা আমাকে খুলে রাখতে হবে কারণ আমার কাছে ঐ একটিই আছে—

—যতক্ষণ আপনার ঘরে আছি ততক্ষণ পরে থাকতে দিন।

—নিশ্চয় নিশ্চয়।

বিল সারফেস জিজ্ঞাসা করল : আচ্ছা ডক্টর এই ইমপালসেসিয়া সম্বন্ধে আপনার মত কি ? সত্যিই কি এটি অন্য গ্রহের জীবের কাণ্ড, তাদের প্রেরিত আলট্রা হাই ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েভ পাঠাবার ফলে হচ্ছে ? তা যদি হয় তাহলে পৃথিবীর সকল মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে না কেন ?

—হ্যাঁ বিল এটি অন্য গ্রহের বুদ্ধিমান জীবের কাণ্ড তবে সব লোক যে এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছে না তার কারণ হল মস্তিষ্কের গঠন ও মস্তিষ্কে গ্রে ম্যাটারের পরিমাণ। এখন ওরা যে মাপের তরঙ্গ পাঠাচ্ছে তাতে কেউ কেউ আক্রান্ত হচ্ছে। তরঙ্গের মাপের পরিবর্তন হলে আর এক দল মানুষ আক্রান্ত হবে।

—আপনি কি করে জানলেন যে ঐ তরঙ্গ অন্য গ্রহ থেকে আসছে ?

—আমরা তো নানারকম পরীক্ষা করেছি তবে তোমাদের একটা জিনিস দেখাচ্ছি। টেড জানালার ব্লাইণ্ডগুলো টেনে দাও তো।

ডক্টর গোভার ড্রয়ার খুলে কালো কাগজের একটা খাম বার করলেন। খামের ভেতর থেকে একটি নেগেটিভ বার করলেন। সেটি একটি ব্যালপটিকন যন্ত্রে পরিয়ে সামনের দেওয়ালে টাঙানো পর্দায় ছবি ফেললেন। ঘর অন্ধকার করে দেওয়াতে ছবি স্পষ্ট হল।

গোভার জিজ্ঞাসা করলেন : কিছু বুঝতে পারছ।

বিল বলল : এ তো গ্রহ নক্ষত্রের ছবি।

—ঠিক। এই দেখ আমাদের আর্থ এই দেখ মুন আর এই হল ভেনাস।

গোভার একটা সরু ছড়ির ডগা দিয়ে সব দেখাতে দেখাতে বললেন।

—আর এই দেখ একটি ক্ষুদে প্ল্যানেট যার নাম এথিরিয়া, আচ্ছা এইবার ভাল করে দেখ, দেখছ ? এথিরিয়ার সঙ্গে আর্থ পর্যন্ত কে

যেন খুব সরু সাদা একটা লাইন টেনে দিয়েছে, ভাল করে দেখ।

—হ্যাঁ ডক্টর আমি দেখতে পাচ্ছি, হেলেন বলল।

—ঐ লাইনটাই হল এথিরিয়া প্রেরিত বেতার তরঙ্গের রেখা।

—আশ্চর্য! এই ছবি আপনি তুললেন কি করে?

—আমি তুলি নি, আমার অনুরোধে অ্যামেরিকান অ্যাস্ট্রোনেট স্পেসশিপ থেকে তুলে দিয়েছে।

—ছবি তো না হয় তুললেন ডক্টর এবং প্রমাণও না হয় হল যে এথিরিয়ানরা আমাদের জব্দ করছে কিন্তু এটা থামানো যায় কি ভাবে?

ব্যালপটিকনের আলো নিবিয়ে নেগেটিভটি ড্রয়ারে সযত্নে তুলে রাখতে রাখতে গোভার বললেনঃ এথিরিয়ার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ করতে হবে। দরকার হলে সেখানে গিয়ে আমাদের ল্যাণ্ড করতে হবে।

—ল্যাণ্ড করতে হবে? সে তো বিরাট ব্যাপার। কিন্তু তার আগে আমরাও কি এথিরিয়ানদের জব্দ করবার জন্যে অনুরূপ বেতার তরঙ্গ পাঠাতে পারি না?

—হয় তো পারি কিন্তু সে তো হবে ইণ্টার প্ল্যানেটারি ওআর এবং এ বিষয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের কি মতামত বা নীতি হবে সেটাও জানতে হবে, অর্থই বা যোগাবে কে? দায়ীত্ব কে নেবে?

—এ সব তো রাজনীতির প্রশ্ন এবং সময়সাপেক্ষ, এজন্যে হয় তো ইউএন-এর জরুরী বৈঠক ডাকতে হবে।

—তবে একটা প্রশ্ন আছে—

—কি প্রশ্ন?

—এথিরিয়ানরা কি এই বেতার তরঙ্গ ইচ্ছে করে পাঠাচ্ছে? সেটা আমাদের জানতে হবে, গোভার বললেন।

—কি করে জানা যাবে? বিল জিজ্ঞাসা করল।

—চেষ্টা করতে হবে।

ডক্টর গোভারের কথা বলার ধরন শুনে মনে হল তিনি চেষ্টা আরম্ভ ক'রে দিয়েছেন তবে এখন কিছু বলবেন না।

—ফ্লাইং সসার বা ইউ-এফ ও কোথা থেকে আসছে?

—সঠিক বলতে পারছি না তবে মনে হয় এথিরিয়া থেকে।

—তাহলে এবার কি করবেন ডক্টর? বিল জিজ্ঞাসা করল।

—আমার সরকার যদি অনুমতি দেয় এবং অর্থ সাহায্য করে বা অন্য কোনো দেশও যদি অর্থ সাহায্য করে তাহলে আমি এথিরিয়া যাব।

—যাবেন? একা?

—তোমরা সঙ্গী হবে? সে সব পরের কথা, সামনের সপ্তাহে আমি প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে আলোচনা করব, জানি না কি ফলাফল হবে কিন্তু আনটিল দেন ইউ মাস্ট কিপ ইয়োর মাউথ শাট।

—সে তো আমরা আগেই লিখে সই করে দিয়েছি।

প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেখা করতে ডক্টর গোভার একা যান নি, সঙ্গে বি ই এস সি-এর চিফ ডক্টর হিউ নিউবেরিকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। টেড মিলারও সঙ্গে ছিল। সঙ্গে কিছু কাগজপত্র, ফটোগ্রাফ ও পরিসংখ্যানও ছিল। ওই জন্যেই টেডকে সঙ্গে নেওয়া। একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ বোঝাই করে এগুলি সে সঙ্গে নিয়েছিল। প্রাইম মিনিস্টার কি জানতে চাইবেন কে জানে?

প্রাইম মিনিস্টার প্রথমেই বললেন তিনি বেশি সময় দিতে পারবেন না বড়জোর আধঘণ্টা কারণ আফ্রিকার একটি ডেলিগেশনের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে।

প্রাইম মিনিস্টার বললেন, ডঃ নিউবেরি তাহলে ভূমিকা না করে আমরা কথা আরম্ভ করি, ডক্টর গোভার তুমিই তাহলে বল।

ডক্টর গোভার একটা নোট তৈরি করে এনেছিলেন। সেখানা তিনি পি-এম-এর টেবিলে রেখে বললেন এটা সময় মতো পড়ে দেখবেন তবে আমাদের বক্তব্য আমি আপনাকে মুখে বলছি।

ডঃ গোভারের বক্তব্য শুনে পি এম হিউ নিউবেরিকে বললেন।

—প্রফেসর তুমি এই ইমপালসেসিয়ার ব্যাপারটা আমাকে এতদিন জানাওনি কেন ?

—কি করে জানাব পি-এম ? ব্যাপারটা যাচাই করতে, প্রমাণ সংগ্রহ করতে, চার্ট তৈরি করতে আমাদের কিছু সময় লেগেছিল তারপর গত এক মাস থেকে আপনার সঙ্গে আমরা একটা অ্যাপয়েন্ট-মেন্ট চাইছি, সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট তো আজ পেলুম তবে ব্যাপারটা আমরা এডুকেশন ও সায়েন্টিফিক মিনিস্টারকে জানিয়েছিলুম।

পি-এম উত্তরে কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর গোভারের নোটের ওপর লাল পেনসিল দিয়ে কয়েক জায়গায় দাগ দিয়ে মার্জিনে কি লিখলেন।

নিউবেরি, গোভার ও টেড নিশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করতে লাগলেন। পি এমকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি কি বলেন দেখা যাক।

পিএম বললেন ঃ ব্যাপারটা যে খুব আর্জেন্ট সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং অবিলম্বে কিছু করা দরকার অথচ এই সমস্যা একা ব্রিটেনের নয়। আমি কালই আমার ক্যাবিনেট মিটিং ডাকছি, অ্যামেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গেও পরামর্শ করতে হবে তবে যা কিছু করব দ্রুত করব, তোমরা দুজন এখন লণ্ডন ছেড়ে কোথাও যাবে না, ডাকা মাত্রই যেন আসতে পার।

—আমরা জানি যে দ্রুত কিছু করা আপনাদের পক্ষে সম্ভব নয় তবুও জানতে চাই আপনারা কতদিনের মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবেন ?

—ব্যাপারটা বিরাট, ধর তোমাদের প্রস্তাবে আমরা যদি রাজি

হই তাহলে এথিরিয়াতে একটা স্পেসশিপ পাঠাবার মতো আমাদের টাকা কোথায়, তারপর অ্যামেরিকা, রাশিয়া প্রমুখ অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় যদি তোমাদের পাঠাতে পারি তাহলেও তো তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে অতএব বুঝতেই পারছ যে আমাদের পক্ষে এখনি জোর করে কিছু বলা সম্ভব নয় তবে ব্যাপারটাকে আমি এই মুহূর্ত থেকে টপ প্রায়রিটি দোব এবং এজন্যে এখনি পৃথক একটা বিভাগ বা 'সেল' গঠন করছি তার মধ্যে তুমিও থাকবে।

—তাহলে পি এম আমরা এখন উঠছি, নিউবেরি বললেন, আধ-ঘণ্টা হল প্রায়, থ্যাংক ইউ।

প্রাইম মিনিস্টার ভার নিয়ে যত তাড়াতাড়ি এই ব্যাপারে অগ্রসব হবেন ভেবেছিলেন তা তিনি পারলেন না। অবিশ্যি তিনি পরপব কয়েকটা ক্যাবিনেট মিটিং-এ ব্যাপারটা আলোচনা কবেছিলেন। পার্লামেন্টেব এক গোপন অধিবেশনে এই সমস্যা নিয়ে আলোচনাও হয়েছে এবং পার্লামেন্টের অনুমতি নিয়ে প্রাইম মিনিস্টার একদিন মার্কিন ও রুশ রাষ্ট্রদূতদের ডেকে আলোচনাও করেছিলেন।

দেখা গেল সমস্যা নিয়ে সকলেই আগ্রহী, কিছু কবা উচিত সে বিষয়েও সকলে একমত কিন্তু কাজ এগোচ্ছে না।

নিউবেরি ও গোভার অপেক্ষা করতে করতে আশা ছেড়ে দিলেন। জেনিভাতে একটা বিজ্ঞান সম্মেলন বসেছিল। যে সকল নোবেল পুরস্কাব বিজয়ী আছেন তাদের একটা সম্মেলন। এই সুযোগে আলাপ আলোচনার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরও কিছু বিজ্ঞানী এলেন। এমন বিজ্ঞানী সম্মেলন ক্বচিৎ হয়।

রিচার্ড গোভারও সেই সম্মেলনীতে গেলেন। তিনি এই সুযোগ ছাড়লেন না। পৃথিবী যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে সে কথাটা তিনি বিজ্ঞানীদের কাছে বললেন, আলোচনা করলেন। এবং সকলকে

অনুরোধ করলেন যে পৃথিবীব্যাপী একটা যৌথ উদ্যোগ করা হক। একটা কিছু বিহিত করতেই হবে নইলে কি মানব সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে নাকি?

নিউবেরি, গোভার এবং ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার তাঁদের যথাসাধ্য করলেন কিন্তু কাজ এগোচ্ছে না। প্রাইম মিনিস্টার বললেন ব্যাপারটা তিনি ইউএনও-তে তুলবেন। তিনি গোভারকে অনুরোধ করলেন একটা প্রবন্ধ রচনা করতে। তিনি সেই প্রবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশ করতে দেবেন এবং প্রেস কনফারেন্স ডেকে একটা বিবৃতি দেবেন। আর দেরি করা উচিত নয়। সরকারী পর্যায়ে যখন ব্যাপারটার সমাধান হচ্ছে না তখন জনমত গঠন করা হক। জনমতের চাপে পড়ে সরকার বাধ্য হয়ে যদি কিছু করে।

কিন্তু হায়। প্রাইম মিনিস্টার কিছু করবার আগে তাঁর সরকারের পতন হল। শীঘ্রই সাধারণ নির্বাচন হবে, নতুন মন্ত্রীসভা গঠিত হবে। আবার নতুন করে কাজে নামতে হবে।

ডক্টর গোভার চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ভাবতে লাগলেন কি করা যায়। ভেবে কিছু ঠিক করতে পারলেন না। একঘেয়েমি কাটা-বার জন্যে তিনি ঠিক করলেন মাসখানেক কোথাও বেড়িয়ে আসবেন। কোনো নির্জন স্থানে যাবেন। সেখানে হয় তো নতুন কোনো আইডিয়া তাঁর মাথায় আসতে পারে।

তাঁর এক বন্ধুর কাছে শুনেছিলেন যে ইণ্ডিয়াতে এমন জায়গা আছে, কাশ্মীর। কিন্তু কাশ্মীরে নাকি অ্যামেরিকান ট্যুরিস্ট গিজ গিজ করে। বন্ধু বললেন তা করে কিন্তু ওখানে একটা নাগিন লেক আছে সেখানে গোভার একা একটা হাউসবোটে যতদিন ইচ্ছে থাকতে পারে।

সেই বন্ধুই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। গোভার কাশ্মীর এসে পাঁচ সপ্তাহ কাটিয়ে গেলেন। ফেরবার পথে দিল্লী থেকে আগ্রা যেয়ে শুধু তাজমহল দেখে গিয়েছিলেন, আর কোথাও যান নি। ছুটিটা

গোভার থি লার পড়ে কাটিয়েছিলেন, আর কিছু করেন নি।

তিনি কোথায় যাচ্ছেন কাউকে বলতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন। জানত শুধু টেড মিলার। সেও কাউকে বলে নি।

গোভার যেদিন ইংলণ্ডে ফিরলেন তারপর দিনই বিল সারফেস তাকে হন্তদন্ত হয়ে টেলিফোন করলেন

—কি ব্যাপার বিল? তুমি অত উত্তেজিত কেন?

—শুনুন ডক্টর হেলেনের ইমপালসেসিয়া সেরে গেছে।

—সেরে গেছে? কবে?

—আজ প্রায় এক সপ্তাহ হল, সে সম্পূর্ণ সুস্থ, আবার সে টেনিস সুইমিং ও ড্যান্সিং আরম্ভ করেছে, আমি ওকে নিয়ে আপনার কাছে কাল যাব।

টেলিফোনে কথা শেষ হল। গোভার ভাবতে লাগলেন তাহলে কি এথিরিয়ানরা তাদের তরঙ্গ উঠিয়ে নিল? গোভার স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ওরা হয় তো এমন কিছু কাজ করছিল যার জন্যে এই তরঙ্গ উৎক্ষেপিত হচ্ছিল, এখন হয় তো সে কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। হেলেন আসুক মাইমোজা যন্ত্র দিয়ে তাকে একবার পরীক্ষা করে দেখবেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেল যাদের যাদের ইমপালসেসিয়া হয়েছিল তারা সকলেই এখন রোগমুক্ত। নিউবেরি ও গোভার দুজনেই নিশ্চিন্ত হলেন।

ডক্টর গোভার নতুন একটা কাজে হাত দেবেন ভাবছেন। সেদিন সকালে এসে তিনি তাঁর সেক্রেটারি মিসেস অলিভিয়াকে ডেকে শর্টহ্যাণ্ডে কিছু নোট দিতে লাগলেন।

ডক্টর গোভার বলে যাচ্ছেন, মিসেস অলিভিয়া শর্টহ্যাণ্ডে লিখে নিচ্ছেন হঠাৎ মিসেস অলিভিয়ার হাত থেকে প্যাড ও পেনসিল পড়ে গেল, তুলতে গেলেন কিন্তু পারলেন না।

—কি হল মিসেস অলিভিয়া

—আমার দুই হাতে ও পায়ে হঠাৎ যেন ইলেকট্রিক শক লাগল, প্যাড ও পেনসিল হাত থেকে পড়ে গেল এবং আমার হাত ও পা এখনও চিন চিন করছে মনে হচ্ছে ভেতরে যেন আরশোলা চলে বেড়াচ্ছে

রিচার্ড গোভার অত্যন্ত বুদ্ধিমান, চোখের পলক না ফেলতে তাঁর ব্রেন কাজ করে, চট করে বুঝতে পারেন কি ঘটছে। তিনি বুঝলেন এথিরিয়ানরা রণকৌশল পরিবর্তন করেছে।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে মাইমোজা যন্ত্র আনলেন, মিসেস অলিভিয়ার মাথায় করোনেট পরিয়ে তার সংযোগ করলেন। তাঁর অনুমান অভ্রান্ত। তবে নতুন এই তরঙ্গের মাপ ও প্রকৃতি ভিন্নরকম।

মাইমোজা যন্ত্র সরিয়ে নিলেন। তার-সংযোগ খুলে নিলেন। জেনের অর্থাৎ মিসেস অলিভিয়ার মাথায় রইল শুধু করোনেট। করোনেটটি মাথা থেকে তুলে নিয়ে গোভার কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট করে জেনের মাথায় আবার পরিয়ে দিলেন।

হেলেনের যেমন সম্পূর্ণ আরাম হয়েছিল জেনের সেরকম আরাম হল না তবে অনুভূতি কিছু কমল। গোভার করোনেট তুলে নিলেন। জেনকে চুপ করে বসিয়ে রেখে তার নাড়ী পরীক্ষা করতে লাগলেন।

মিসেস অলিভিয়া প্রায় পনেরো মিনিট ধরে সেই শক অনুভব করলেন কিন্তু তারপরই তাঁর হাত ও পা কিছুক্ষণের জন্যে অবশ হয়ে গেল। এই অবস্থা রইল আরও প্রায় পনেরো মিনিট তারপরই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

সিকিউরিটি বিভাগ মারফত খোঁজ নিয়ে জানা গেল যারা ইমপালসেসিয়ায় ভুগছিল তারা সকলে ব্যাধিমুক্ত কিন্তু কিছু কিছু লোক অভিযোগ করছে তারা সহসা তাদের হাতে পায়ে বৈদ্যুতিক শক অনুভব করে। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে তাদের হাতও পায়ের ভেতরে কিছু যেন ঘুরে বেড়ায়। এই অবস্থা থেমে গেলে তাদের হাত ও পা সম্পূর্ণ অবশ হয়ে যায়। তারা এই সময় কিছুই

করতে পারে না, যেন অপারেশনের আগে ওষুধ ইঞ্জেকশন দিয়ে তাদের হাত ও পা অবশ করে দেওয়া হয়েছে।

ডক্টর গোভার ভাবতে লাগলেন তা হলে কি এথিরিয়ানরা তাদের সমরকৌশল পরিবর্তন করছে? যাদের ইমপালসেসিয়া হয়েছিল তাদের কিন্তু এই নতুন শ্যক আক্রমণ করছে না। এথিরিয়ানরা নিশ্চয় বৈত্যুতিক তরঙ্গের মাপের হেরফের করছে যে জন্যে এবার লক্ষ্যস্থল মানুষের হাত পা। এই সঙ্গে বৈত্যুতিক তরঙ্গে এমন কিছু আছে যার জন্যে আগে যাদের ইমপালসেসিয়া হয়েছিল তাদের এবার কিছু হচ্ছে না। মানুষের যেমন একবার চিকেন পক্স হলে দ্বিতীয়বার হয় না সেইরকম আর কি।

আর দেরি করা যায় না। সরকার পক্ষ থেকে আর কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তারা ঘরে ও বাইরের নানারকম রাজনীতিক ব্যাপার নিয়ে এমন জড়িয়ে পড়েছে যে আর কোনো দিকে মন দিতে পারছে না।

আর মন দিতে পারলেই বা কি হবে, সরকারের টাকা কোথায়? এখন যা কিছু করতে হবে নিজেদের চেষ্টায় করতে হবে। দরকার হয় ব্রিটিশ সরকারের অনুমতি নিয়ে গোভার অ্যামেরিকানদের সাহায্য চাইবেন।

পৃথিবী দারুণ এক সঙ্কটে পড়েছে। এথিরিয়ানদের মতলব বোঝা যাচ্ছে না। আজ তারা মানুষের ওপর পরীক্ষা চালাচ্ছে কাল হয় তো তারা এমন একটা রশ্মি পাঠাবে যার ফলে সারা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষেতের গম ঝরে পড়ে যাবে কিংবা জমির ধানগুলি কুঁকড়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

সরকার যদি কিছু না করে, অ্যামেরিকা বা অন্য দেশ তার সাহায্য ভিক্ষা যদি প্রত্যাখান করে তা হলে শেষ চেষ্টা রূপে তিনি এথিরিয়া গ্রহ লক্ষ্য করে পৃথিবী থেকে প্রচণ্ড শক্তিশালী রেডিও ওয়েভ পাঠাবেন। বাঁচতে হলে সংগ্রাম করতেই হবে। তাদের

হাতে যে সব যন্ত্রপাতি আছে তার সাহায্যে এ কাজ তারা করতে পারবে।

তবে একবার বি. ই. এস. সি-এর ডিরেক্টর ডঃ হিউ নিউবেরির সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

ডঃ নিউবেরির সঙ্গে দেখা করে ডঃ গোভার বললেন ; এথিরিয়ান সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হচ্ছে অথচ আমাদের সরকার কিছু করে উঠতে পারছেন না তাই আমি আপনার কাছে একটা প্রস্তাব করতে চাই

—কি প্রস্তাব

—আমি নিজে একটা পোর্টেবল স্পেসসিপ বানিয়ে এথিরিয়াতে যেতে চাই। স্পেসশিপ বানাতে অনেক টাকা দরকার, সে টাকা আমার নেই—

—কত টাকা অনুমান করছেন ?

—অ্যাটমিক পাওয়ারে চলবে অথচ ভারি হবে না, আমি এমন একটা স্পেসশিপের ব্লু প্রিণ্ট তৈরি করেছি, তিনজন যাত্রী বহন করতে পারবে। তার স্পিড হবে ঘণ্টায় তিন হাজার মাইল খরচ পড়বে পঁচিশ হাজার পাউণ্ড, ঐ পঁচিশ হাজার পাউণ্ড আপনাকে যোগাড় করে দিতে হবে।

—আমি কোথায় টাকা পাব ? হিউ নিউবেরি বলে।

—আপনাকে পেতে হবে না। আমাদের দেশে বিমান তৈরির এবং মোটর গাড়ি তৈরির যে সব বড় বড় কম্পানি আছে তাদের মালিকদের ডেকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে তাদের অনুরোধ করুন যে তারা যেন আমাদের স্পেসশিপটা তৈরি করে দেয়, মনে হয় তারা রাজি হবে।

—রাজি হলেও কাজটা তো গোপনে করতে হবে।

—হ্যাঁ নিশ্চয়, আমি তাদের মধ্যে কাজটা এমন ভাবে ভাগ করে দেবো যে তারা বুঝতেই পারবে না কি তৈরি হচ্ছে।

—কিন্তু চূড়ান্ত রূপটা তো দিতে হবে এবং টেস্ট করার ব্যাপার আছে।

—সেগুলো সলসবেরিতে আমাদের নিজেদের কারখানাতেই করা যাবে তবে আপনি আপনার ফাণ্ড থেকে এক হাজার পাউণ্ড দেবেন।

—কেন ?

—স্পেসশিপ চালাবার জন্যে আমি আমাদের সাইক্লোট্রোনে অ্যাটমিক পাওয়ার ইউনিট কুরিআম-সেভেন তৈরি করে নেব, এই কুরিয়াম যা মাদাম কুরির নামের স্মৃতি বহন করছে তা তৈরি করা সহজ অথচ, ইউরেনিয়ম বা প্লুটোনিয়ম অপেক্ষা শক্তিশালী ও দীর্ঘস্থায়ী।

কুরিআম থেকে যে হানিকর রেডিও-অ্যাকটিভ রশ্মি বিচ্ছুরিত হবে তা থেকে নিজেদের রক্ষার জন্যে তো সীসের প্রাচীর দিতে হবে স্পেসশিপ তো ভারি হয়ে যাবে।

—আমি তার ব্যবস্থা করেছি ডঃ নিউবেরি, কুরিআম থেকে নির্গত রেডিও-অ্যাকটিভ রশ্মি একটা পকেটে জমা হবে পরে সেই রশ্মি মহাশূন্যে ছড়িয়ে দোব, এজন্যে সীসের যে আবরণ দিতে হবে তা মোটেই ভারি হবে না, আমি আপনাকে পরীক্ষা করে দেখাব।

—তার আগে তোমার স্পেসশিপের ব্লু-প্রিন্ট আমাকে দেখিয়ো—

—দেখাব তো নিশ্চয় !

—তুমি কি একা যাবে ?

—আমার সঙ্গে টেড মিলার যাবে আর বিল সারফেস রাজি হলে তাকে সঙ্গে নোব, আপনি তাহলে ইতিমধ্যে বিমান ও মোটর গাড়ির কারখানার মালিকদের সঙ্গে কথা বলুন, আমি একবার সাউথ অ্যামেরিকার পেরু যাব, সেখানে অপারেশন ডায়নার কাজকর্ম দেখব এবং সম্ভব হলে কোনো ফ্লাইং সসারের সঙ্গে যোগাযোগ করবার চেষ্টা করব। অ্যাডামস্কি যেমন করেছিল।

ডঃ নিউবেরি-কি চিন্তা করে জিজ্ঞাসা করলেন—

—পঁচিশ হাজার পাউণ্ডে হবে তো ?

—হবে, তবে আপনি যদি আরও বেশি টাকা যোগাড় করতে পারেন আমার আপত্তি নেই, আমাদের দেশে তো স্টীল প্ল্যাণ্ট আছে তাদেরও দলে টানুন না।

—দাঁড়াও একটা লিস্ট তৈরি করি।

ডঃ নিউবেরি ও ডঃ গোভার দুজনে মিলে ইংলণ্ডের বড় বড় শিল্প-মালিকদের একটা লিস্ট তৈরি করলেন। এদের একটা কনফারেন্স ডেকে প্রস্তাবটা করা হবে! প্রস্তাবের একটা খসড়া ডঃ গোভার করে রাখবেন।

ডঃ নিউবেরি বললেন ঃ আমি তাহলে আগামী সপ্তাহে লণ্ডনে মালিকদের ডেকে পাঠাই, তুমি ঐ কনফারেন্সের পর সাউথ অ্যামেরিকায় যেয়ো, কনফারেন্সে তোমার থাকা দরকার।

—আমি থাকব।

হিউ নিউবেরি আহুত কনফারেন্স আপাত দৃষ্টিতে সাফল্যমণ্ডিত। কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারীরা সহযোগিতা করতে রাজি হল। ডঃ নিউবেরি তাঁদের বোঝাতে পেরেছিলেন যে পৃথিবীর সামনে অভাবনীয় এক বিপদ উপস্থিত হয়েছে। এর ভবিষ্যত কেউ বলতে পারে না। তবে ধ্বংস অনিবার্য বলে মনে হচ্ছে।

ডঃ নিউবেরি বলেন যে ডঃ গোভার ইতিমধ্যে কাজে নেমেছেন এবং তিনি একাই লড়াই করে চলেছেন। তিনি নীজের জীবন বিপন্ন করে সেই গ্রহে যাবার সংকল্প করেছেন। তিনি আশা করেন যে তিনি সেই গ্রহের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে পারবেন।

অ্যামেরিকার তিনটি বিরাট প্রতিষ্ঠান যথা জেনারেল মোটরস, ইউ এস স্টীল এবং নরথ প এয়ারক্র্যাফট করপোরেশনে, ব্রিটেনের রুটস গ্রুপ, ম্যাঞ্চেসটার এরোপ্লেন কম্পানি ডঃ গোভারের ব্লু-প্রিন্ট অনুসারে স্পেসক্র্যাফট তৈরি করে দিতে রাজি হলেন।

ডঃ নিউবেরি তাদের স্পষ্ট করে বলে দিলেন যে এজন্যে তিনি বা তাঁর প্রতিষ্ঠান বি ই. এস. সি. একটিও পয়সা দিতে পারবেন না কারণ আপাততঃ সরকারী সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না। আশা করা যায় যে ডঃ গোভারের অভিযান সফল হলে বিভিন্ন দেশের সরকার টাকা দিতে রাজি হবেন।

উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি বললেন টাকার দরকার নেই, তারা বিনা-পয়সাতেই আকাশযানটি তৈরি করে দেবেন।

তাদের সামনে ব্লু-প্রিন্ট ফেলে দেওয়া হল। একজন প্রশ্ন করলেন—

—স্পেসক্র্যাফট চলবে কিসে? ব্লু-প্রিন্টে তার তো কোনো আভাস পাওয়া যাচ্ছে না—

ডঃ নিউবেরি বললেনঃ সেটা আপাতত গোপন রাখা হয়েছে তবু এইটুকু বলতে পারি যে নিউক্লিয়ার পাওয়ার দ্বারা স্পেস-ক্র্যাফটিকে কিছু দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হবে তারপর মহাশূন্য থেকে অফুরন্ত সৌরশক্তি আহরণ করে স্পেসক্র্যাফট চালান হবে তবে কিভাবে এই দুই বিভিন্ন রকম শক্তি ব্যবহার করা হবে সেটুকু এখন জানানো হবে না।

—তাহলে এঞ্জিন কে তৈরি করবে? একজন প্রশ্ন করলেন।

—এঞ্জিন অথাৎ শক্তি আহরণ সঞ্চয় ও ব্যয় সংক্রান্ত যান্ত্রিক ব্যাপারটা সলসবেরিতে আমাদের বি ই. এস. সি-এর কারখানায় তৈরি হবে। ডক্টর গোভার কয়েকদিনের জন্যে সাউথ অ্যামেরিকা যাচ্ছেন। তিনি ফিরে এসে আপনাদের মধ্যে কাজ ভাগ করে দেবেন এবং হয় তো একটা মডেল স্পেসক্র্যাফটও আপনাদের দেখাতে পারেন। ডঃ গোভার তো এই কনফারেন্সে উপস্থিত রয়েছেন, আপনারা ইচ্ছে করলে তাঁকে প্রশ্ন করতে পারেন।

কনফারেন্সের গোড়াতেই ডক্টর গোভার সেই ইমপালসেসিয়া থেকে শুরু করে একটা বিবৃতি দিয়েছিলেন। প্রশ্ন করার বিশেষ

কিছু বাকি ছিল না।

কনফারেন্স শেষ হল। তিন দিন পরে ডঃ গোভার তাঁর নিত্যসঙ্গী টেড মিলারকে নিয়ে সাউথ অ্যামেরিকা যাত্রা করলেন।

পেরুর রাজধানী লিমা শহরে টেড মিলারকে সঙ্গে নিয়ে ডঃ রিচার্ড গোভার যখন নামলেন তখন রাত্রি বেশ গভীর। আবহাওয়া খারাপ থাকার জন্যে প্লেন এক জায়গায় তিন ঘণ্টা আটকে ছিল।

অত রাত্রি হলেও এয়ারপোর্টে দুজন লোক ডঃ গোভারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। একজন হলেন পেরু সায়েন্স অ্যাকাডেমির ডঃ এনরিক ব্যালিনো আর অপরজন অপারেশন ডায়নার প্রতিনিধি জে পি স্মিথ।

ডঃ এনরিক ব্যালিনো বেশ কয়েক বছর লণ্ডনে ক্যাভেণ্ডিস ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করেছিলেন। সেই সময়ে ডঃ গোভারের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। দুই বন্ধুতে অনেক দিন দেখা হয় নি। ডঃ গোভারই চিঠি লিখেছিলেন যে তিনি পেরু যাচ্ছেন কিন্তু উদ্দেশ্য বলেন নি।

ডঃ ব্যালিনো কিছুতেই ডঃ গোভারকে হোটেলে যেতে দিলেন না। নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। জে পি স্মিথ হোটেলে উঠেছিল। পরদিন সকালে জেপিকে দেখা করতে বলে গোভার বন্ধুর গাড়িতে উঠলেন।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্টের কিছু পরে জেপি এসে হাজির। ডঃ ব্যালিনো ওদের দুজনকে কথা বলার সুযোগ দিয়ে নিজের স্টাডিতে চলে গেলেন।

জেপিকে ডঃ গোভার প্রথমেই প্রশ্ন করলেন হালে শেষ কবে ফ্লাইং সসার দেখা গিয়েছিল ?

জেপি জানত ডঃ গোভার এইরকম প্রশ্ন করবেন। সেজন্যে জেপি একখানা ডায়েরি সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল, তাতে ফ্লাইং সসার

দেখার তারিখ এবং অন্যান্য কিছু তথ্য নোট করা ছিল।

—অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের অপারেশন ডায়না স্টেশনের কাছে শেষ কবে ফ্লাইং সসার দেখা গিয়েছিল? প্লিজ ওয়ান মিনিট ডক্টর গোভার তারিখটা আমি বলছি।

কয়েকটা পাতা উলটে গোভারকে জেপি তারিখটা বলল।

—কোন তারিখ বললে জেপি? আর একবার ভাল করে দেখে বল তো।

জেপি আবার তারিখ ও সময় বলল।

—হুঁ, দিনের বেলায়...

ডক্টর গোভার গম্ভীর হয়ে কি চিন্তা করলেন। জেপি যে তারিখ ও সময় বলল ঠিক ঐ তারিখে ও সময়ে তাঁর সেক্রেটারি জেন অলিভিয়া সলসবেরিতে তাঁরই ঘরে ইমপালসেসিয়া দ্বারা প্রথম আক্রান্ত হয়েছিল।

—ফটো তুলতে পেরেছিলে? ডঃ গোভার জিজ্ঞাসা করেন।

—তুলেছি, স্ট্রোবোস্কোপ ক্যামেরার সাহায্যে ভাল ছবি উঠেছে, এই দেখুন প্রিণ্ট এনেছি।

আজ পর্যন্ত ফ্লাইং সসার বা ইউ. এফ. ও-এর অপারেশন ডায়না যত ছবি তুলেছে তার মধ্যে এই ছবিখানা খুব স্পষ্ট হয়েছে। স্ট্রোবোস্কোপ ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য হল গতিকে থামিয়ে ছবি তুলতে পারে। ধাবমান কোনো বস্তু বা চলন্ত কোনো মেসিনের মুহূর্তের জন্যে গতি যেন স্তব্ধ করে দেয় এই ক্যামেরা।

ডঃ গোভার দেখলেন এতদিন তাঁরা যত ফ্লাইং সসার দেখেছেন সবগুলিই গোলাকার কিন্তু এটি ঘোড়ার নালের আকারের যাকে বলে হর্স শু শেপ। হর্স শু-এর দুই প্রান্ত দিয়ে তীব্র বেগে যেন ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

—আর একখানা ছবি দেখুন ডক্টর গোভার। এই ছবিখানা ইনফ্রা-রেড প্লেট দিয়ে তোলা। ছবিখানা ভাগ্যক্রমে পেয়ে গেছি।

—কি রকম ?

—আমাদের একজন সহযোগী অ্যাণ্ডিজের তুষারাবৃত একটি মাউন্টেন পিক-এর ছবি তোলবার জন্য ইনফ্রা-রেড প্লেট পরানো তার ক্যামেরা সেট করে রেখেছিল আর সেই সময়ে ফ্লাইং সসারটা দূর আকাশ দিয়ে ফিরে যাচ্ছিল আর আমাদের সহযোগী সঙ্গে সঙ্গে শাটার টিপে দিয়েছে, ছবিখানা এসে গেছে।

ইনফ্রা-রেড প্লেটের বৈশিষ্ট্য হল যে কুয়াশা ভেদ করেও লক্ষ্য বস্তুর ছবি তুলতে পারে।

ছবি দুখানি দেখে ডক্টর গোভার সন্তুষ্ট হয়ে প্রশ্ন করলেন—

—আমার স্পটে যাবার কি ব্যবস্থা করেছ ? আমি একা যাব না। সঙ্গে টেড মিলারও যাবে, সে এখন একটু বেরিয়েছে, একটু পরেই ফিরবে।

—আমরা এখান থেকে প্লেনে যাব ক্রুজিলো। ক্রুজিলো থেকে ছোট রেলে আমাদের মাইল তিরিশ যেতে হবে। একটা ছোট স্টেশনে নেমে তিন মাইল যেতে হবে। সেখান থেকে হেলিকপটারে আমাদের স্টেশনে, আপনি সঙ্গে যথেষ্ট গরম পোশাক এনেছেন তো ?

—কেন ? খুব শীত নাকি ?

—হ্যাঁ খুব শীত তবে খটখটে শুকনো শীত।

—আমরা কখন স্টার্ট করব ?

—আজই যদি লাঞ্চের পর যাই।

—না, লাঞ্চের পর গেলে সুবিধে হবে না ; কারণ ক্রুজিলোর প্লেন ওখানে যেয়ে নামবে বিকেলে এবং তারপরে ছোট লাইনের ট্রেন ধরে আমরা যে স্টেশনে নামব সেখানে পৌছতে রাত্রি হয়ে যাবে ওখানে রাত্রি যাপন করার মতো ভাল হোটেল নেই।

—তাহলে ?

—আমরা আজই স্টার্ট করি, রাত্রিটা ক্রুজিলোতে থাকব, কাল ভোরে ট্রেন ধরে আমাদের স্টেশনের দিকে যাওয়া যাবে।

—বেশ তুমি তাহলে প্লেনে সিট বুক করে আমাকে খবর দিয়ো। তিনটে সিট।

জেপি ঠিকই বলেছিল। অপারেশন ডায়না স্টেশনটি এমনিতেই প্রায় আট হাজার ফুট উঁচুতে, শীত তো হবেই তবে এত বেশি শীত ডঃ গোভার ও টেড মিলার আশা করেন নি।

ডঃ গোভার স্টেশনের লগবুক পরীক্ষা করতে লাগলেন। ফ্লাইং-সসার যাওয়া আসার একটা ধারণা করা গেল। কতদিন অন্তর তারা আসে এবং কোন সময় আসে তার আভাস পাওয়া গেল।

ডঃ গোভার একটা জিনিস লক্ষ্য করলেন যে গত এক বছরে ফ্লাইং সসার একটিও অমাবস্যা বাদ দেয়নি। প্রতি অমাবস্যার রাত্রে এগারোটা থেকে বারোটার মধ্যে তাদের দেখা গেছে।

—এমন কোন ইঙ্গিত পেয়েছ কি তোমরা যে ঐ সময়ে সসার কাছে কোথাও ল্যাণ্ড করে? ডঃ গোভার প্রশ্ন করেন।

—ওরা এখান থেকে চার কিলোমিটার দূরে পাহাড়ের গায়ে একটা সমান্তরাল জায়গায় নামে, আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি, মানে জায়গাটা আমরা দেখে এসেছি, বেশ বড় একটা জায়গা, ফুটবল খেলার মাঠের মতো হবে, ছোট প্লেন ল্যাণ্ড করতে পারে।

—কি প্রমাণ পেয়েছ?

—জমির ওপর কে যেন গোল চাকা ঘুরিয়েছে আর মাঝে মাঝে হলদে রঙের চটচটে একটা পদার্থও পড়ে থাকতে দেখা যায়।

—হ্যাঁ, ঐ পদার্থের খবর আমরা জানি তবে ঐ পদার্থের মৌলিক উপাদান আমরা জানতে পারি নি। যাক গে, সেই জায়গাতে আমাকে কাল ভোরে নিয়ে যেতে পারবে? কত উঁচুতে?

—না, বেশি উঁচুতে নয়, আমরা যে উচ্চতায় আছি সেই উচ্চতাতেই তবে চড়াই উৎরাই করতে হবে, আমরা মিউলের পিঠে চেপে যাব।

—তুমি তাহলে ব্যবস্থা করে রাখ।

ডঃ গোভার ক্যালেণ্ডার দেখলেন। আর তিন দিন পরেই অমাবস্যা। ঐদিন রাত্রি এগারোটার সময় টেডকে নিয়ে তিনি সেই ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে অপেক্ষা করবেন।

কিন্তু সেই অমাবস্যার রাত্রে যে এমনটা ঘটবে তা ডঃ গোভার আশা করেন নি। তিনি যা আশা করেন নি তার অতিরিক্ত কিছু ঘটেছিল।

ক্রমে সেই অমাবস্যার রাত্রি এল। সেদিন শীত যেন আরও বেশি, হাড় কাঁপানো। ডক্টর এবং টেড উভয়েই উপযুক্ত গরম পোশাক পরেছেন।

সন্ধ্যা হতেই দুজনে প্রস্তুত। উক্টর গোভার তাঁর মাইমোজা ও নিউটন যন্ত্র নিয়ে প্রস্তুত। সঙ্গে ছোটোখাটো আরও কিছু দুএকটা যন্ত্র নিয়েছেন। একটা ডায়েরিও নিতে ভোলেন নি। পেরুতে আসা অবধি তিনি ডায়েরি লিখে যাচ্ছিলেন।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হতেই ডক্টর গোভার এবং টেড কিছু খেয়ে নিলেন তবুও স্টেশনের লোকেরা সঙ্গে বেশ কিছু স্যাণ্ডউইচ এবং ফ্লাস্কে কফি এবং কিছু ব্র্যাণ্ডি দিয়ে দিলেন।

ছোট একটা তাঁবু নিয়ে সঙ্গে দুজন লোক চলল। তারা তাঁবু খাটিয়ে দিয়ে ফিরে আসবে এবং পরদিন ভোরে যেয়ে ওদের দুজনকে নিয়ে আসবে।

কুয়াশা নেমেছে। তবে গভীর নয়। কুয়াশায় পথ চিনে ও পাহাড়ী পথে সাবধানে যেতে যেতে রাত্রি প্রায় দশটা বেজে গেল।

লোক দুজন তাঁবু খাটিয়ে ও সামনে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে বিদায় নিল।

স্টেশনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবার জন্যে টেড মিলার একটা রেডিও ট্রান্সমিটার ও রিসিভার এনেছিল, বলা যেতে পারে সীমিত পাল্লার ওয়াকি টকি।

ফ্লাইং সসার ল্যাণ্ডিং সাইটে পৌঁছে টেড মিলার অপারেশন ডায়না স্টেশনের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করল। রাত্রি দশটা বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। লোক দুজন ফিরে যাচ্ছে। কুয়াশা এখানে পাতলা, বোধহয় ঝরে যাচ্ছে। সসার অবতরণ করলেই আবার বার্তা বিনিময় হবে।

চারিদিক অন্ধকার অনেক দূরে দূরে পেরু ইণ্ডিয়ানদের গ্রামে দু একটা আলো মিটমিট করছে। তাও অস্পষ্ট। রাত্রি এগারোটা বাজবার কয়েক মিনিট আগে কুয়াশা সরে গেল

ডক্টর গোভার তাঁর ডায়েরিতে নোট রাখছেন।

কুয়াশা সরে যেতেই ডক্টর গোভার প্রথমে তাঁর মাইমোজা যন্ত্রটি চালু করে টেডকে বললেন সেদিকে নজর রাখতে। ক্যাম্পে ব্যবহার উপযোগী টর্চ সঙ্গে নিতে টেড ভোলে নি। সে তার পিঠে বাঁধা হ্যাভারস্যাক থেকে টর্চ বার করে জ্বেলে মাইমোজার দিকে নজর রাখল।

ডক্টর গোভার আশা করছিলেন যে ফ্লাইং সসার আসবার আগে মাইমোজা যন্ত্রে বেতার তরঙ্গ ধরা পড়বে। সেইজন্যে টেডকে বলে দিলেন মাইমোজার দিকে নজর রাখতে আর তিনি নিজে শক্তিশালী একটা দূরবীণে চোখ লাগিয়ে আকশের দিকে চেয়ে রইলেন।

টেড মিলার মাঝে মাঝে স্টেশনের সঙ্গে বার্তা বিনিময় করছে। ওরা একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে মাঝে মাঝে গান বাজাচ্ছে।

রাত্রি তখন এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট। টেড মিলারের রেডিও যন্ত্রে সুন্দর একটা ওয়ালটজ সুর বাজছিল। হঠাৎ সেই সঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল। কি ব্যাপার? গান শুনতে থাকলেও টেডের নজর ছিল মাইমোজা যন্ত্রের দিকে। এ কি? মাইমোজা যন্ত্রও যেন তার কাজ করছে না।

ডক্টর গোভার দূরবীনে চোখ লাগিয়ে রয়েছেন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে দূরবীনের লেনস ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে, লেনসে যেন ছাতা

পড়ছে। চোখ থেকে দূরবীন নামিয়ে দেখলেন চাপ চাপ কুয়াশা তাদের দিকে এগিয়ে আসছে।

টেড বলল : ডক্টর আমার ট্রান্সমিটার এবং মাইমোজা দুটোই কাজ করছে না।

ডক্টর বললেন : ঐ দেখ চাপ চাপ কুয়াশা এগিয়ে আসছে, এই কুয়াশা যদি আমাদের ঘিরে ফেলে তাহলে আমরা কিছুই দেখতে পাব না, আমাদের সব পরিশ্রম ব্যর্থ হবে।

ওদিকে তখন অপারেশন ডায়না স্টেশনেও রেডিও যন্ত্র তো বিকল হয়েছে। শুধু তাই নয়, ওদের ইলেকট্রিক জেনারেটরও যেন খারাপ হয়ে গেল। দপ করে সব আলো নিবে গেল।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে স্টেশনের আলো আবার জ্বলে উঠল, ট্রান্সমিটারও আবার সচল হল। স্টেশন থেকে জে পি স্মিথ ডক্টর গোভারের উদ্দেশ্যে বার্তা পাঠালেন কিন্তু কোনো উত্তর নেই। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করে জেপি নিরাশ হল। ভাবল ওদের যন্ত্র বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে।

কিন্তু তাদের জেনারেটর এবং ট্রান্সমিটার হঠাৎ কিছুক্ষণের জন্যে বিকল হয়ে গেল কেন? আর তাদের ক্যাম্পে মাইকেল রসের পায়ে যেন ইলেকট্রিক শক লাগল। অনেকক্ষণ চিন চিন করার পর সে তার পা তুলতে পারছে না। পা যেন অবশ হয়ে গেছে।

ডঃ গোভার এবং টেড মিলারের কোনো বিপদ হয় নি তো? জেপি সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগল ওদের কাছে যাবে কি না কিন্তু এমন সময় ঝড় উঠল। এই ঝড়ে অন্ধকার রাত্রে পাহাড়ী পথে যাওয়া বিপজ্জনক। ঝড় থামলে বৃষ্টি আরম্ভ হতে পারে, পথ পিচ্ছিল হবে তখন তো যাওয়া অসম্ভব। যা হয় কাল ভোরে দেখা যাবে।

পরদিন ভোর হতেই তিনজন সঙ্গী নিয়ে জেপি যাত্রা করল কিন্তু গোভারের ক্যাম্পে এসে দেখল ক্যাম্প, ট্রান্সমিটার যন্ত্র, একটি

দূরবীন ও টর্চ পড়ে রয়েছে কিন্তু ডঃ গোভার বা টেড মিলার অদৃশ্য। ওরা কাছাকাছি অঞ্চল ঘুরতে ঘুরতে ডক্টর এবং টেডের নাম ধরে ডাকাডাকি করতে লাগল কিন্তু কোনো উত্তর নেই, প্রতিধ্বনি ফিরে আসতে লাগল।

সবিস্ময়ে জে পি সেই সমান্তরাল ভূমির এক জায়গায় লক্ষ্য করল, মাটির ওপর যেন কেউ বড় একটা চাকা শুইয়ে ফেলে জোরে ঘুরিয়েছে, মাটি ছিন্নভিন্ন।

তা হলে কাল অমাবস্যার রাত্রে এখানে ফ্লাইং সসার নেমেছিল। তারা কি ডঃ গোভার ও টেড মিলারকে নিয়ে গেল নাকি?

জেপি ব্যাপারটা তখনই ইংলণ্ডে ডঃ হিউ নিউবেরিকে জানিয়ে দিল। ডঃ গোভার এবং টেড মিলার নিখোঁজ। তাদের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না।

ডঃ নিউবেরি বললেন যে পরেই যে প্লেন পাবেন সেই প্লেনে তিনি পেরু যাচ্ছেন এবং তিনি নিজে সরেজমিনে তদন্ত করবেন, জেপি যেন ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটনা গোপন রাখে।

পেরু পৌঁছেই ডঃ নিউবেরি অপারেশন ডায়না স্টেশনে পৌঁছে প্রথমে জে পি স্মিথের কাছ থেকে ঘটনার বিবরণ শুনলেন। ইলেক-ট্রিক জেনারেটর বিকল, ট্রান্সমিটার বিকল এবং মাইকেল রস নামে একজন কর্মীর ইমপালসেসিয়া, সব শুনলেন তারপর তিনি জেপিকে নিয়ে সেখানে গেলেন যেখানে ডঃ গোভার ও টেড মিলার অমাবস্যার কালো রাত্রে ক্যাম্প ফেলে ফ্লাইং সসারের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন।

বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি। এখানে ছোট প্লেন ল্যাণ্ড করতে পারে। ডঃ নিউবেরি লক্ষ্য করলেন গোভার যেখানে ক্যাম্প করেছিলেন সেখান থেকে মাত্র চল্লিশ গজ দূরে খানিকটা গোলাকার জায়গার মাটি কে যেন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলে নিয়েছে। সেজন্যে এখানে যেন কেউ একটা ধারালো চাকা ঘুরিয়েছিল।

তা হলে কি ফ্লাইং সসারের তলদেশে এমন কোনো চাকা লাগানো থাকে যে চাকা সসার আকাশে ওড়বার আগে জোরে ঘোরাতে হয়। হয়তো তাই নইলে এই রকম চিহ্ন এখানে হল কি করে? এই চিহ্ন আগেও দেখা গেছে ইংলণ্ডের দক্ষিণে এক দ্বীপে, একটি বারলি ক্ষেতেও দেখা গিয়েছিল।

ডঃ নিউবেরি বিশ্বাস করলেন যে এখানে ফ্লাইং সসার নেমেছিল এবং তারা ডঃ গোভার ও টেড মিলারকে নিয়ে গেছে। নইলে তারা গেল কোথায়?

যাবার আগে ডঃ গোভার সম্ভবতঃ কোনো বার্তা রেখে যাবার সময় পান নি তবে তিনি তাঁর মাইমোজা, নিউটন যন্ত্র এবং টুকিটাকি দু একটা যন্ত্র নিয়ে গেছেন। টেডের পিঠে যে হ্যাভারস্যাকটা বাঁধা ছিল সেটাও পাওয়া যাচ্ছে না। টেড সেটা নিশ্চয় সঙ্গেই নিয়ে গেছে।

অমাবস্যার পরের দিন সকালে অনুসন্ধান করতে এসে জেপি কোনো পায়ের চিহ্ন লক্ষ্য করেনি। পায়ের চিহ্ন যে দেখার প্রয়োজন আছে এটা তার মাথায় আসেনি। সে ক্যাম্প ও ফেলে যাওয়া জিনিস তন্ন তন্ন করে দেখেছিল। কোনো সূত্র পায় নি। ডঃ নিউবেরি যখন এলেন তখন কোনো পায়ের চিহ্ন দেখতে পাননি। এই কয়েক-দিনের মধ্যে সব চিহ্ন বিলুপ্ত। ইতিমধ্যে বৃষ্টিও হয়েছিল।

তাহলে সত্যিই কি ডঃ সোভার এবং টেড মিলার ফ্লাইং সসারে চেপে অন্য কোথাও চলে গেলেন? তবে এ সবই অনুমান মাত্র। হদিশ দিতে পারেন একমাত্র ডঃ গোভার স্বয়ং কিন্তু তিনি এখন কোথায়?

এ ঘটনা কেউ বিশ্বাস করবে না। প্রচার হলে ডঃ নিউবেরি তথা বি-ই-এস-সিকে হাস্যস্পদ হতে হবে। তার চেয়ে সঠিক কোনো প্রমাণ না পাওয়া পর্যন্ত ডঃ গোভার ও টেড মিলারের নিরুদ্দেশ কাহিনী গোপন রাখা হ'ক।

রাত্রি যখন এগারোটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট, ডঃ গোভার যখন দূরবীণে চোখ লাগিয়ে অন্ধকার আকাশের দিকে সসার দেখবার আশা করছেন ঠিক সেই সময়ে তাঁর মনে হল দূরবীণের লেনস যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। চোখ নামিয়ে দেখলেন মাইমোজা যন্ত্রও যেন কাজ করছে না। টেড বলছে তার রেডিও বন্ধ হয়ে গেল। ওদিকে চাপ চাপ কুয়াশা নেমে আসছে।

হঠাৎ এমন পরিবর্তন কেন? তাহলে কি সত্যিই কিছু ঘটতে যাচ্ছে? জেপি তাঁকে বলেছিল যে অমাবস্যার রাত্রে এই সময়ে তারা সসার অবতরণ লক্ষ্য করেছে কিন্তু তিনি সসার আগমন দেখতে পেলেন না কেন? জেপি তো কুয়াশা বা কোনো যন্ত্র বিকল হওয়ার কথা বলে নি। তাদের লগবুকেও সেরকম কিছু নোট করা নেই।

ডঃ গোভার এবং টেড মিলার ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে এলেন। টেড মিলারের পিঠে তখনও তার হ্যাভারস্যাক বাঁধা রয়েছে, হাতে সেই টর্চটা রয়েছে।

ডক্টর গোভার কি মনে করে এক হাতে নিউটন ও অপর হাতে মাইমোজা যন্ত্র তুলে নিয়েছেন। ক্যাম্পের বাইরে এসে তারা দুজনে দাঁড়ালেন।

দুজনেই একসঙ্গে লক্ষ্য করলেন চল্লিশ গজ আন্দাজ দূরে কুয়াশা ভেদ করে কি যেন একটা নামল। তারা দেখলেন ঘোড়ার নালের আকারের চ্যাপ্টা ধরনের একটা আকাশযান। সেই আকাশ-যানের গা থেকে হলদে আলোর আভা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে।

তারপর সেই আকাশযানের মাঝখানে ঝাঁপ পড়ার মতো একটা দরজা কে যেন ভেতরে থেকে ঠেলা মেরে ফেলে দিল কিন্তু কোনো আওয়াজ শোনা গেল না।

তারপর সেই দরজা দিয়ে দুজন মানুষ বেরিয়ে এল। তাদের গায়ে নীলরঙের ইউনিফরম, মাথায় হলদে হেলমেট। তারা এসে ওদের দুজনের সামনে দাঁড়াল তারপর ইসারা করে সেই আকাশযানে

ওঠবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাল।

গোভার ও টেড যেন এই আমন্ত্রণের আশায় ছিল। দ্বিরুক্তি না করে ওরা দুজন গ্রহান্তরের সেই মানুষ দুজনকে অনুসরণ করে সেই আকাশযানে প্রবেশ করল।

প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল। একজন ব্যোমচারী হাত বাড়িয়ে একটা কেবিনের দরজা খুলে দিয়ে গোভার ও টেডকে ভেতরে ঢুকতে বলল। গোভার ও টেড কেবিনে ঢুকল, ব্যোমচারীও তাদের অনুসরণ করে ভেতরে এসে কি বলল, ওরা বুঝতে পারল না।

কেবিনটা ছোট। উচ্চতা সাত ফুট হবে। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে আট ফুট বাই আট ফুট হবে মনে হল। ওরই মধ্যে প্রায় অর্ধেক জুড়ে একটা শয্যা পাতা রয়েছে। ব্যোমচারী নিজে শয্যায় শুয়ে ওদের ইঙ্গিত করল শুয়ে পড়তে।

ইতিমধ্যে আকাশযানটি কাঁপতে শুরু করেছে। নীচে কি যেন একটা ঘুরছে। ব্যোমচারী উঠে পড়ে ওদের গায়ে হাত দিয়ে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে বলল। তাড়াতাড়ি শোয়াবার নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে বুঝতে পেরে গোভার নিজে শুয়ে পড়ে টেডকে শুয়ে পড়তে বলল। ওরা শয্যাগ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে আকাশযান জমি ছেড়ে ওপরে উঠতে লাগল।

বাইরে ছিল প্রচণ্ড শীত। গায়ে ছিল গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলওয়ালা মোটা গরম কোট। কেবিনের ভেতর তাপ-নিয়ন্ত্রিত। এখন ওদের গরম হতে লাগল। গোভার ও টেড শুয়ে শুয়েই কোট খুলে পাশে রেখে দিল।

কেবিনের ভেতর ফিকে নীল আলো কিন্তু অদৃশ্য। এতক্ষণ ওরা অনুভব করেনি, এখন মনে হল একটা যেন মৃদু গন্ধ সঞ্চারমান। গন্ধটা তাদের চেনা নয়, কিন্তু বেশ মিষ্টি গন্ধ। সেই গন্ধের প্রভাবেই হ'ক বা তাদের দেহ ক্লান্ত থাকার জন্যেই হ'ক ওদের ঝিমুনি ধরল।

অনেক চেষ্টা করেও ডঃ গোভার ঘুম এড়াতে পারলেন না। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। টেডও ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুমিয়ে পড়ল? না ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হল। কেবিনের মধ্যে ঐ যে মৃদু সৌরভ, ওরই মধ্যে নিহিত ছিল ঘুম পাড়ানি ঘোর।

এক সময়ে ঘোর কেটে গেল, ওদের ঘুম ভাঙল। ঘরের নীলাভ আলো ক্রমশঃ সাদা হয়ে গেল। উজ্জ্বল সাদা আলো।

কেবিন থেকে বেরোবার যে কোনো দরজা আছে তা বোঝা যাচ্ছে না। কেবিন কি ধাতুর তৈরি কে জানে। গোভার কেবিনের দেওয়ালে টোকা দিলেন, যে আওয়াজ হল সে আওয়াজের সঙ্গে তিনি পরিচিত নন। দেওয়ালগুলি তাঁর পরিচিত কোন ধাতু বা বস্তুর তৈরি নয় বলেই তাঁর মনে হল।

গোভার এই সব চিন্তা করছেন এমন সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল কেবিনের একদিকের দেওয়ালে খানিকটা চৌকো অংশ যেন স্বচ্ছ হয়ে গেল। একি অদ্ভুত ব্যাপার! তিনি ও টেড দুজনেই উঠে বসলেন। সেই স্বচ্ছ জানালা দিয়ে দুজনেই মহাকাশ দৃশ্য উপভোগ করতে লাগলেন।

এর আগে দুজনের মধ্যে একজনও মহাকাশ ভ্রমণ করেন নি। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন অনুভূতি। ঐ তো দূরে ছেড়ে আসা পৃথিবী দেখা যাচ্ছে, সবুজ। সামনে চাঁদ, ক্রমশঃ বড় হচ্ছে।

সমস্ত আকাশযানটির ভেতর বোধহয় অকসিজেন সরবরাহ ব্যবস্থা আছে। নিঃশ্বাস নিতে কোনো অসুবিধে হচ্ছে না।

টেড মাঝে মাঝে মহাকাশ দেখছে আবার মাঝে মাঝে কেবিনের ভেতরটাও লক্ষ্য করছে। হঠাৎ তার মনে হল তার বাঁ দিকে যেন একটা দরজা রয়েছে। কৌতুহলী হয়ে দরজাটা আস্তে আস্তে ঠেলল। আরে এ যে ক্ষুদে একটা বাথরুম!

কত সময় কাটল, কতদূর অতিক্রম করা গেল কে জানে। দুজনের

হাতেই অটোম্যাটিক ডে-এন-ডেট ঘড়ি আছে কিন্তু ঘড়ির কথা ওদের মনে নেই।

টেড বলল ক্ষিধে পাচ্ছে। তাছাড়া চা বা কফি কিছুই তো পেটে পড়ে নি। তাদের মনের কথা কেউ বুঝি শুনতে পাচ্ছিল। সহসা দরজা খুলে গেল। ট্রে হাতে একজন প্রবেশ করল। ওদের সামনে ট্রে বসিয়ে সে চলে গেল।

দুটি গেলাস ভর্তি গরম পানীয় আর একটা ডিশে বিস্কুটের মতো অনেকগুলি কিছু খাবার। পানীয়ের স্বাদটা না চা, না কফি না চকোলেট কিন্তু বিস্বাদ নয়। খেতে বেশ ভাল। বিস্কুটগুলি খেয়ে মনে হল যেন ওগুলি মাংসর তৈরি। হতে পারে। মাংস শুকিয়ে তাকে গুঁড়ো করে তার সঙ্গে অন্য কিছু মিশিয়ে এই খাবার তৈরি করা হচ্ছে।

যখনি তাদের খাবার দেওয়া হয়েছে তখনি এই একই পানীয় ও বিস্কুট এসেছে। এক ঘেয়ে লাগলেও হজমে কোনো বিঘ্ন হয় নি। বার বার একই মানুষ এসে খাবার দিয়ে যাচ্ছে। তার মুখ থেকে কোনো আওয়াজ শোনা যায় নি।

ডঃ গোভার ডায়রি লিখছেন। এটা যে একটা ফ্লাইং সসার সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত। যারা এটি তৈরি করেছে তাদের কারিগরি বিদ্যা পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নত।

এই সসার যারা চালাচ্ছে তারা আজ্ঞাবাহী মাত্র। কিন্তু এরা তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? এথিরিয়া গ্রহতে কি?

গোভার তাঁর মাইমোজা যন্ত্র থেকে কোনো সাহায্য পাচ্ছেন না। মানুষটি যখন খাবার দিতে আসে তখন তিনি যন্ত্রটি রেডি রাখেন। দু একটা প্রশ্ন করেন কিন্তু কোনো উত্তর পান না।

অতএব এথিরিয়া বা যে গ্রহতে তাঁরা ল্যাণ্ড করছেন সে পর্যন্ত চুপচাপ থাকাই ভাল।

প্রচণ্ড গতিতে আকাশযান ছুটে চলেছে। তাদের কেবিন

সাউণ্ড-প্রুফ হলেও একটানা ও এক ঘেয়ে একটা আওয়াজ তাদের কানে আসছে। একঘেয়েমি দূর করবার জন্যেই বোধহয় মাঝে মাঝে বেশ কিছুক্ষণ ধরে বিচিত্র সুরের সঙ্গীত বেজে উঠছে।

গোভার তাঁর ডায়রিতে লিখছেন কিছুদিন থেকে শোনা যাচ্ছে অন্য গ্রহ থেকে দেবতারা নাকি পৃথিবীতে যেয়ে মানবসভ্যতার সূত্রপাত করেছিল। এ বিষয়ে কিছু কিছু প্রমাণও নাকি সংগ্রহ করা হয়েছে।

গোভার সন্দেহ করছেন পৃথিবীর মানুষ তাদের উৎস যাই হক না কেন তারাই কি সুদূর অতীতে অন্য কোনো গ্রহে যেয়ে সেখানে নতুন সভ্যতার সূচনা করেছিল? সেই গ্রহের নাম কি এথিরিয়া? এ সবই অবশ্য অনুমান। এথিরিয়া বা সেই গ্রহে না পৌছনো পর্যন্ত কিছুই বলা যাচ্ছে না।

সাত দিন কেটে গেল।

গোভার ডায়েরি লেখেন, কি সব অঙ্ক কষেন। ডায়াগ্রাম আঁকেন। মাঝে মাঝে নিজের মনে মনে বলেন, ইস আমার স্পেস সম্বন্ধে নোটগুলো আনতে পারলে ভাল হত। কয়েকটা ক্যাল-কুলেশন···কথা শেষ না করে মাথার ওপরে পা তুলে শীর্ষাসন করেন।

টেডকে বলেন যোগব্যায়াম করা ভাল। তুমিও কিছু ব্যায়াম কর টেড, ছোট একটা কেবিনে বন্দী হয়ে আছ, ব্যায়াম না করলে ক্ষিধে হবে না, হাত পা নাড়তে পারবে না, মেজাজ খারাপ হবে।

টেড যোগব্যায়াম করতে পারে না তবে সে ডন বৈঠক করে। গোভার বলেন ঐতেই হবে। শরীর সুস্থ থাকলে মনও সুস্থ থাকবে।

টেড সেই ছোট জানালার দিকে মুখ করে বাইরে দেখছিল। হঠাৎ সেই জানালাটা বন্ধ হয়ে গেল কিন্তু তার পায়ের নীচে আর

একটা জানালা খুলে গেল।

সেই জানালার দিকে দৃষ্টিপাত করে দুজনেই বলে উঠল, এ কি? তারা কি আবার পৃথিবীতে ফিরে এল নাকি?

সসারের গতি এখন অনেক কমে গেছে। সসার এখন অবতরণ করছে কিন্তু কোথায় অবতরণ করছে? একটা দূরবীণ থাকলে বোঝা যেত।

এবার স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাহাড়, নীল ও সবুজ পাহাড়, সবুজ মাঠ, অরণ্যভূমি, নীল সমুদ্র, ভূমধ্য সাগরের চেয়েও নীল, রূপোলি নদী, ওদিকে বোধহয় সাদা বালির মরুভূমি।

না। এই প্রকৃতি পৃথিবীর সঙ্গে মিলছে না। পাহাড় যা দেখা যাচ্ছে তা হিমালয়ের মতো উঁচু নয়, নদীগুলিও বেশি চওড়া নয়।

আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই রহস্যের সমাধান হবে। সসার নামতে নামতে পরিষ্কার একটা জমিতে নামল। কাছাকাছি কোনো বাড়ি বা এমন কোনো নিদর্শন নেই যা দেখে বোঝা যেতে পারে যে এটা একটা ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড। দ্বিতীয় কোনো সসারও নেই। তবে লম্বা একটা থাম দেখা গেল। সেই থামের গা থেকে একটা বোর্ড ঝুলছে, বোর্ডে কয়েকটা দাগ টানা রয়েছে।

সসারটি এত আস্তে নামল যে গোভার বা টেড কিছুই টের পেল না। ওদের কেবিনের দরজা খুলল। হলদে হেলমেট পরা একজন মানুষ এসে ওদের নামবার জন্য ইসারা করল।

গোভার তার যন্ত্রপাতি এবং টেড তার হ্যাভারস্যাক নিয়ে সসার থেকে নেমে পড়ল। ওরা নামার সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ হয়ে গেল এবং হুস করে সসারটি কোথায় উড়ে চলে গেল।

কি ব্যাপার? দুজনে হতবাক হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। প্রথম কথা বললেন ডঃ গোভার। টেডকে জিজ্ঞাসা করলেন—নিশ্বেস নিতে কোনো কষ্ট হচ্ছে?

টেড যেন বোকা হয়ে গেছে। মুখে কথা নেই। তবুও মাথা

নেড়ে জানাল যে নিশ্বেস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে না। তারপর মুখ খুলল। বলল

—কিন্তু ডক্টর আমরা এলুম কোথায়। মনে তো হচ্ছে পৃথিবীরই কোনো অনাবিষ্কৃত অঞ্চলে আমরা এসেছি। সবই তো দেখছি আমাদের পৃথিবীরই মতোই, খালি গাছের পাতা অন্য রকম, কিন্তু ··

—কিন্তু কি ? আমাদের এই পাণ্ডব বর্জিত দেশে ফেলে দিয়ে ওরা পালাল কোথায় ? সত্যিই, কোনো রকম জীব তো দেখা যাচ্ছেই না এমন কি বাড়িঘর বা সভ্যতার কোনো নিদর্শন দেখা যাচ্ছে না তবে ওরা যখন আমাদের এনে ফেলেছে তখন ব্যবস্থা কিছু হবেই।

—কে জানে এখানকার প্রাণীরা হয় তো গাছপালার সঙ্গে ক্যামুফ্লাজ হয়ে আছে। আমার কি রকম মনে হচ্ছে। এদেশে বোধহয় পাখিও নেই

—ঘাবড়িও না। একটু অপেক্ষা করাই যাক না নইলে আমরাই অভিযানে বেরোব। কি বলছিলে ? পাখি নেই ? ঐ দেখ। ঐ গাছটার সরু ডালটার দিকে চেয়ে দেখ।. সার সার অনেক পাখি বসে রয়েছে। ঠিক যেন বদরু পাখি তবে সবকটা এক রঙা

—আমি একটু বসলুম. আপনিও বসুন।

গোভার বসলেন না। টেড বসতে না বসতেই উঠে দাঁড়াল।

—ঐ দেখুন ডঃ গোভার, ঐ গাছটার মাথার ওপর। র‍্যামজেট হেলিকপটার আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন মার্কিন আবিষ্কারক একটা মিনি হেলিকপটার তৈরি করেছিল। নাম দিয়েছিল র‍্যামজেট। একজন মাত্র লোক বসতে পারত। বসবার সিটের নীচে থাকত এঞ্জিন। এঞ্জিন থেকে ওপরে একটা ডাণ্ডা উঠেছিল। সেই ডাণ্ডার মাথায় চার ব্লেডওয়ালা একটা পাখা ঘুরত।

র‍্যামজেট বেশি দূর যেতে পারত না। বেশি ফুয়েল নেবার তার ক্ষমতা ছিল না। ফুয়েল ট্যাংক ছোট ছিল। তার সীমা

ছিল বড় জোর এক মাইল। অ্যামেরিকায় এক স্কাইস্ক্রেপারের ছাদ থেকে আর এক স্কাইস্ক্রেপারের ছাদে অনায়াসে যেতে পারত। র‍্যামজেটের চাহিদা হয় নি। চাহিদা হলে হয়ত পাইকারি হারে তৈরি হত।

কিন্তু এই র‍্যামজেটগুলি তো বেশ জোরে আসছে। এবং মনে হয় একমাইলের বেশি দূর থেকেই আসছে কারণ এক মাইলের মধ্যে সভ্যতার কোনো চিহ্ন চোখে পড়ে না।

সসারে আসবার সময় ডঃ গোভার চিন্তা করেছিলেন যে এরা যারাই হক না কেন মহাকাশযানের ফুয়েল সমস্যার সমাধান করেছে।

এরা এমন কোনো শক্তির সন্ধান পেয়েছে যার দ্বারা অতি অল্পেই কাজ হয়। দীর্ঘস্থায়ী অথচ ঝামেলাবিহীন। কিছুদিন আগে অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের ওপর হলদে রঙের খানিকটা চটচটে পদার্থ পাওয়া গিয়েছিল। সেই হলদে রঙের চটচটে পদার্থই কি এদের ফুয়েল ?

টেড গুণে দেখল পাশাপাশি ন খানা র‍্যামজেট উড়ে আসছে। ওরা যেখানে দাঁড়িয়েছিল সেখান থেকে দশ গজ দূরে ওরা সার বেঁধে নামল।

কোনো তফাত নেই। এরা যেন পৃথিবীরই মানুষ। অন্য কোনো দেশ থেকে এল। এদের পরিধানে ছাই রঙের ইউনিফর্ম মাথায় লাল হেলমেট।

র‍্যামজেট থেকে নেমে ওরা সার বেঁধে অর্ধ বৃত্তাকারে দাঁড়াল।

গোভার ইতিমধ্যে তাঁর নিউটন যন্ত্র প্রস্তুত রেখেছেন। ওরা যদি কিছু কথা বলে তাহলে এই যন্ত্র মারফত তিনি তা বুঝতে পারবেন। আবার তিনি নিজে যখন কোনো কথা বলবেন তখন সেটি বোঝবার জন্যে ওদের কানে একটি ইয়ারফোন লাগিয়ে দেবেন।

নিউটন যন্ত্রটি ওরা লক্ষ্য করছিল। ডঃ গোভার শান্তির ভঙ্গিতে হাত তুলে ওদের দিকে চেয়ে হাসলেন। মাঝখানের অর্থাৎ পঞ্চম ব্যক্তিটি কথা বলতে আরম্ভ করল। সঙ্গে সঙ্গে নিউটন যন্ত্রে বেতার তরঙ্গের রেখা ফুটে উঠল। ডঃ গোভার তো আগেই ইয়ারফোন পরেছিলেন।

সেই পঞ্চম ব্যক্তি নিজের ভাষায় কথা আরম্ভ করল। কণ্ঠস্বর পৃথিবীর মানুষেরই মতো। সে বলল।

—আমাদের এই জীবন কেন্দ্রের নাম এথিরিয়া। তুমি যে জীবনকেন্দ্র থেকে আসছ তার নাম নিশ্চয় আর্থ। আমাদের এই জীবনকেন্দ্রে এমন কিছু নিদর্শন রক্ষিত আছে যা থেকে আমরা জানতে পেরেছি যে কয়েক লক্ষ বৎসর পূর্বে আমরা স্বতন্ত্র এক গ্রহে বাস করতুম, সেখান থেকে আমাদের পূর্বপুরুষেরা কিছু জীব আর্থ নামে জীবনকেন্দ্রে নিয়ে গিয়েছিল এবং কিছু জীব এই এথিরিয়া জীবনকেন্দ্রে এনেছিলেন, কি ভাবে এনেছিলেন তা আমরা আজও জানি না। আমাদের মতো অন্য কোনো জীবনকেন্দ্র আছে কি না আমরা জানি না, তোমরা জান কি ?

বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার তো ! গোভার মনে মনে স্থির করলেন যে এথিরিয়ার এই জীবকে মানুষ বলাই উচিত কারণ তাঁদের সঙ্গে ওর কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা দেখা যাচ্ছে তা হল যে এদের গায়ের রং খুব ফর্সা, মাথার চুল বাদামী, চোখ নীল, নাক খাড়া তবে আপাততঃ যে কজনকে দেখা যাচ্ছে তারা কেউ লম্বা নয়।

আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে গোভার চমৎকৃত হলেন যে লোকটির ভাষার মধ্যে এমন কিছু শব্দ রয়েছে বা পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার সমতুল। গোভার প্রাচীন হিব্রু, ল্যাটিন বা সংস্কৃত শব্দ বেশি জানেন না তবে তিনি তাঁর গবেষণা কাজের সুবাদে যে সব প্রাচীন শব্দ জানেন সেগুলির সঙ্গে এথিরিয়াগামী ব্যবহৃত অনেক শব্দের সঙ্গে মিল রয়েছে অতএব তিনি যা কথা বলবেন তা তাঁর

নিউটন যন্ত্র মারফত বুঝে নিতে ওদের অসুবিধে হবে না বলে মনে হয়।

ডঃ গোভার করজোড় করে লোকটিকে অভিবাদন জানিয়ে একটি ইয়ারফোন লোকটির কানে লাগিয়ে দিলেন। সেজন্যে তার মাথার হলদে হেলমেটটি একটু সরাতে হয়েছিল কিন্তু সে বাধা দেয় নি।

ড ঃ গোভার বলতে লাগলেন ঃ তোমাদের অনুমান ঠিক, আমরা যে জীবনকেন্দ্র থেকে আসছি তার নাম আর্থ তবে আমরা জীবন-কেন্দ্র কথাটি ব্যবহার করি না, আমরা বলি প্ল্যানেট। আমি নিজে তোমাদের জীবনকেন্দ্রে আসবার জন্যে চেষ্টা করছিলুম যাই হক যোগাযোগ হয়ে গেছে, এতে আমি খুশি, আমার কিছু বক্তব্য আছে সে কথা আমি কার কাছে বলব ? তুমি কে ?

উত্তরে লোকটি বললঃ আমাদের ইচ্ছে ছিল আর্থ নামে জীবন-কেন্দ্র থেকে আমরা কাউকে এখানে এনে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি, আমাদের সেই ইচ্ছা পূর্ণ হল। আমি একজন রক্ষী মাত্র ! তোমরা এই যে ন জনের দল দেখছ এই রকম আরও ন'টি দল আছে। আমি হলুম তাদের নেতা। তোমাকে আমরা আমাদের নিবাসে নিয়ে যাব সেখানে আমাদের লিডান তোমার সঙ্গে কথা বলবেন।

টেড তার হ্যাভারস্যাক থেকে তার রিভলভারটি আগেই বার করে নিয়েছিল। এথিরিয়বাসীরা সেটির দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছিল।

গোভারকে টেড জিজ্ঞাসা করল লিডান আবার কি ? কারণ এথিরিয়ার সেই মানুষ লিডান শব্দটি বেশ কয়েকবার ব্যবহার করল।

গোভার বলল ঃ লিডান শব্দের অর্থ হল সর্বোচ্চ নেতা।

—এই জীবগুলো কি শুধু কথাই বলবে ? কিছু খেতে দেবে না ? এ দিকে ক্ষিধেয় আমার নাড়ীভুড়ি শুকিয়ে যাবার উপক্রম। একটু বলুন।

গোভার তখন অপর পক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল।

—বেশ তুমি আমাদের নিয়ে চল, আমরা খুব ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, বিশ্রাম প্রয়োজন।

লোকটি লজ্জিত হয়ে ক্ষমা চাইল। বলল ঃ নিশ্চয় নিশ্চয় আমি এখনি ব্যবস্থা করছি।

সেই নেতা তখন দুজনকে নিম্নস্বরে কি বলতেই তারা তাদের র‍্যামজেট চেপে কোথায় চলে গেল।

ইতিমধ্যে কৌতূহল দমন করতে না পেরে টেড মিলারের হাতে রক্ষিত রিভলভারটি দেখিয়ে গোভারকে জিজ্ঞাসা করল ঃ ওটা কি ?

—তোমরা জান না বুঝি ? ওটা হল প্রাণী বা মানুষ হত্যা করবার যন্ত্র।

—তাই নাকি ?

সে যেন ভয় পেয়ে গেল। ঢোঁক গিলল। তারপর বলল—

—দেখাতে পার ?

—পারি কিন্তু কি হত্যা করব বল ?

লোকটি এদিক ওদিক চাইল তারপর কাছে একটা গাছের ডালে আঙুল দেখিয়ে বলল।

—ঐ দেখ ডালে ছোট একটা জন্তু বসে রয়েছে, ওরা পাখি খেয়ে শেষ করে ফেলল, ওটাকে মারতে পার।

গোভার টেডকে ইসারা করতেই টেড এগিয়ে এসে জন্তুটাকে দেখল। জন্তুটা একটা বনবেড়াল, গায়ে বাঘের মতো ডোরা।

টেড লক্ষ্য স্থির করে ট্রিগার টিপল। ড্রাম। জন্তুটা ডাল থেকে নীচে পড়ে একটু ছটফট করে মরে গেল।

এই মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে বাকি দু জন রক্ষী ভয় পেয়ে মাটিতে উবুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। তারা হয় তো ভাবল যে টেড তাদেরও ঐ অস্ত্র দিয়ে ঐ জন্তুটার মতো মেরে ফেলবে। এই গ্রহে নিশ্চয় রিভলবার বা বন্দুকের মতো কোনো মারণাস্ত্র নেই।

গোভার তখন অভয় দিয়ে নেতাকে বলল ঃ ওদের উঠতে বল, ওদের কোনো ভয় নেই, আমরা এখানে হত্যা করতে আসি নি। নেতার মুখে তখন এক আনন্দের হাসি উদ্ভাসিত হয়েছে। সে যেন কি খুঁজে পেয়েছে। কি ব্যাপার ?

গোভার জিজ্ঞাসা করল তার আনন্দের কারণ কি ? নেতা বলল যে, সে কিছু বলবে না। যা বলবার লিডান বলবে।

এদিকে সেই দুজন মানুষ তাদের র‍্যামজেট চেপে ফিরে এসেছে। তাদের দুজনের পিঠে কি যেন বাঁধা রয়েছে।

ওরা জমিতে অবতরণ করে র‍্যামজেট থেকে নেমে নিজের পিঠ থেকে বোঝা দুটি নামিয়ে খুলতে আরম্ভ করল। আরে এ তো দুটি র‍্যামজেট। এরা তো দেখা যাচ্ছে র‍্যামজেটগুলি দিব্যি মুড়ে রেখেছে ফোল্ডিং চেয়ারের মতো।

কি করে চালাতে হবে তা ওদের নেতা গোভার ও টেডকে বুঝিয়ে দিল। পৃথিবীতে যে সব র‍্যামজেট চালু আছে তাদের সঙ্গে এর যন্ত্রপাতির তফাত আছে।

পৃথিবীর র‍্যামজেট চলে পেট্রল বা ক্রুড অয়েলে কিন্তু এদের ফুয়েল ভিন্ন পদার্থ তাই এঞ্জিন ও অন্যরকম তবে স্টার্ট দেবার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি একই রকম।

তবে ব্যাপার এতই সহজ যে বুঝে নিতে দু মিনিটও লাগল না। হাজার হো'ক গোভার ও টেড তো আনাড়ি নয়।

টেড, ডঃ গোভার, নেতা এবং রক্ষীগণ নিজ নিজ র‍্যামজেটে উঠে বসল। ডঃ গোভারের মালপত্র যা ছিল সবই তারা সযত্নে আগেই উঠিয়ে নিয়েছিল।

নেতার নির্দেশ পেয়ে সকলে আকাশে উঠল। ওরা আগে চলল। ওদের অনুসরণ করে চলল ডঃ গোভার ও টেড মিলার।

গ্রহটার ভূ-প্রকৃতি ওপর থেকে ডঃ গোভার লক্ষ্য করতে লাগলেন। পৃথিবীর সঙ্গে তফাত খুব বেশি নেই। নদী, নালা বা হ্রদের সংখ্যা

বোধহয় বেশি অন্ততঃ যে অঞ্চলের ওপর দিয়ে ওরা উড়ে যাচ্ছেন সে অঞ্চলে তো বটেই।

ওরা বেশি উঁচু দিয়ে যাচ্ছিল না চার পাঁচশ' ফুটের বেশি হবে না। গাছ আছে নানারকম তবে এক রকম গাছের সংখ্যাই বেশি ; ছাতার মতো গাছ, পনেরো ষোলো ফুটের বেশি উঁচু হবে না বোধহয়।

কি সব জন্তু চবে বেড়াচ্ছে। ওপর থেকে মনে হচ্ছে ভেড়া, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তবে সংখ্যায় অনেক। নানারকম পাখিও দেখা যাচ্ছে।

পাহাড়গুলিও গাছে আবৃত। এইসব গাছে নানারকম ফুল ফুটেছে। নদী, পাহাড় ও গাছ মিলিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্য ভারি সুন্দর। তবে মানুষ বা বাড়িঘর বেশি দেখা যাচ্ছে না। জনসংখ্যা বোধহয় কম।

এথিরিয়ানরা নীচে নামল। ওদের দেখাদেখি এরা দুজনও নীচে নামল। নীচে মানে জমিতে নয়, উচ্চতা কমাল। এখন ওরা তিরিশ ফুট উচ্চতায় উড়ে চলেছে।

সামনে একটা পাহাড়। হাজার ফুট উঁচু হবে। পাহাড়ের ওধারে কি আছে দেখা যাচ্ছে না। ডঃ গোভার ও টেড ভাবছে পাহাড় অতিক্রম করবার জন্যে উঠতে হবে বোধহয়।

না। ওরা উঠল না। পাহাড়েব কাছে আসতেই পৃথিবীর বাড়ির মতো কাঠামো দেখা গেল। এতক্ষণ বোঝা যায় নি। কাছে আসতে বোঝা গেল। পাহাড়েব গায়ে অনেক বাড়ি রয়েছে, মানুষও অনেক চলাফেরা করছে।

বাড়িগুলির রং পাহাড়েব বঙের সঙ্গে মিশে গেছে তাই উড়ে আসবার সময় পাহাড় দেখতে পেলেও ওরা বাড়ি দেখতে পায় নি। এখানে বোধহয় সব বাড়ি পাহাড়ের গায়ে। হতে পারে। নদীনালার সংখ্যা প্রচুর। বন্যা হলে সব বোধহয় ডুবে যায় তাই ওরা

পাহাড়ের গায়ে বাড়ি করেছে।

মারবেল জাতীয় কোনোরকম মসৃণ সবুজ রঙের পাথরের তৈরি বিরাট একটা চত্বরে ওরা নামল।

ওরা সকলেই নিজ নিজ র‍্যামজেট থেকে নেমে পড়ল। ডঃ গোভার লক্ষ্য করলেন যে ওরা ওদের যন্ত্রপাতিগুলির প্রতি বিশেষ যত্ন নিচ্ছে।

চত্বরে নেমে ডঃ গোভার ও টেড মিলারের মনে হল ওরা যেন কারপেটের ওপর নামলেন। পাথর হলেও বেশ নরম তবে পা বসে যাচ্ছে না, আওয়াজও হচ্ছে। ঠিক যেন কর্ক।

প্রথমে নেতা তারপর পাশাপাশি ডঃ গোভার ও টেড মিলার এবং তাদের পিছনে রক্ষীদের দল এগিয়ে চলল।

পাহাড়ের গা কেটে সুন্দর একটা অলিন্দ তৈরি করা হয়েছে। দু পাশ দিয়ে সিঁড়ি। অনেকটা ঠাকুর দালানের মতো। বারান্দা পার হয়ে প্রশস্ত একটা হল।

হলে দুধারে অনেক বেঞ্চি পাতা রয়েছে। রক্ষীদের নেতা আগন্তুকদের একটা বেঞ্চে বসতে বলল। রক্ষীরা একটু তফাতে মেঝেতে বসে পড়ল। তারা বুঝে নিয়েছে এরা শত্রু নয়। এদের কাছ থেকে কোনো বিপদ আসবে না।

হল পার হয়ে নেতা ভেতরে কোথাও চলে গেল। ভেতরের ঘরগুলি বোধহয় পাহাড়ের ভেতর, পাহাড় কেটে তৈরি করা হয়েছে।

অনুমানে বোঝা গেল এইটেই বোধহয় লিডানের হেডকোয়ার্টার বা বাসস্থান। লিডান ও তার পরিবার বোধহয় এখানেই থাকে।

এতক্ষণ পর্যন্ত ডঃ গোভার এথিরিয়ার বেশি মানুষ দেখেন নি। মাত্র কয়েকজন। তিনি লক্ষ্য করলেন যে এদের সকলের গায়ের রং প্রায় একই রকম, কেউ কালো নয়, কেউ সাহেবদের মতো ফর্সাও নয়। বোধহয় এখানকার জল হাওয়ার জন্যে এমনটা হয়!

তিনি আরও লক্ষ্য করলেন এদের উচ্চতা, দৈহিক গঠন এবং চেহারায় বিশেষ তফাৎ নেই। লোক চেনা মুশকিল।

হলে কোনো ছবি বা ঘড়ি বা সময় নির্দেশক ঘড়ি জাতীয় কিছু নেই। আলোও দেখা যাচ্ছে না।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। টেড চঞ্চল হয়ে উঠল। তার খুব ক্ষিধে পেয়েছে। তার হ্যাভারস্যাকেও কোনো খাবার অবশিষ্ট নেই। ডঃ গোভারেরও একই অবস্থা কিন্তু তিনি কিছু বলছেন না।

তিনি তাঁর ডায়েরিতে কিছু নোট করে চলেছেন। মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন।

প্রায় পনেরো মিনিট পরে রক্ষীদের নেতা তিনজনকে নিয়ে ফিরে এল, দুজন পুরুষ একজন মহিলা। পুরুষ দুজনের পরণে হলদে রঙের পোশাক, মহিলার লাল রঙের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলওয়ালা এক কাটের ফ্রক। ছোট গলা, কনুই পর্যন্ত হাতা।

ডঃ গোভার তাঁর নিউটন যন্ত্র ঠিক করে রাখলেন।

আগন্তুক তিনজন একটি বেঞ্চিতে বসলেন। রক্ষীনেতা পরিচয় করিয়ে দিল। ইনি আমাদের লিডান, ইনি লিডানের পত্নী আর ইনি লিডানের পরামর্শদাতা।

ডঃ গোভার কোমর নীচু করে সকলকে অভিবাদন জানিয়ে নিউটন যন্ত্র থেকে ইয়ারফোন বার করে লিডানের কানে লাগিয়ে দিলেন।

এথিরিয়া গ্রহে আগমনের উদ্দেশ্য জানিয়ে ডঃ গোভার প্রথমেই বললেন যে তারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত, তাদের আগে কিছু খেতে দেওয়া হোক।

লিডান অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং রক্ষীদের নেতাকে ভর্ৎসনা করলেন তারপর পকেট থেকে ছোট্ট একটা যন্ত্র বার করলেন, অনেকটা পকেট ট্রানজিস্টরের মতো দেখতে। সেই যন্ত্রে কিছু নাড়াচাড়া করে কিছু কথা বললেন।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে খাবার ও পানীয় এসে গেল। একটা প্লেটে হালুয়া জাতীয় একটা খাবার রয়েছে আর সেই খাবার ঘিরে ছোট

ছোট লাল একরকম ফল সাজান রয়েছে। ঐ খাবার নিশ্চয় ঐ ফল সহযোগে খাবার নিয়ম। প্লেটে একটা চামচও রয়েছে। এক পাত করে পানীয়ও দেওয়া হয়েছে।

ডঃ গোভার ভেবেছিলেন যে এই খাবারের স্বাদ বুঝি মিষ্টি কিন্তু খেয়ে দেখলেন ঈষৎ ঝাল কিন্তু অত্যন্ত সুস্বাদু। বোধহয় মাংস জাতীয় কিছু খাবার। পানীয়টি যে কি বোঝা গেল না, না চা, না কফি, না কোকো কিন্তু বেশ উত্তেজক।

পাতগুলি কিসের তৈরি? এথিরিয়ার মাটির? ওপরে অন্য কিছু পদার্থের প্রলেপ দেওয়া আছে বোধহয়।

ঐ খাদ্য নাকি এক রকম পাখির মাংস। পাখি সেদ্ধ করে তার দেহ থেকে সরু সরু হাড় বার করে কিছু মশলা মিশিয়ে ঐ খাবার তৈরী করা হয় এবং ঐ ক্ষুদ্র লাল ফল বিনা ঐ পাখির মাংস স্বাদ-হীন। আর পানীয়টি? একটি গাছের ফল। সেই ফল শুকিয়ে গুঁড়ো করে জলে মিশিয়ে ফুটিয়ে ছাঁকলেই ঐ পানীয় তৈরী হয়।

আহার ও পানীয় গ্রহণ করে দুজনে এখন সুস্থ। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক।

লিডান বলল আর্থ বা এথিরিয়া কোথাও মানুষ সৃষ্টি হয়নি। তাদের গ্রহের প্রাচীন পুঁথি থেকে জানা যায় যে আদি মানুষ সৃষ্টি হয়েছে মহাশূন্যে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের যোগাযোগের ফলে। সেই আদি মানুষ মহাশূন্য থেকে বিভিন্ন গ্রহে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে।

যে গ্রহের পরিবেশের সঙ্গে সেই আদি মানুষ সংগ্রাম করতে পেরেছে জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করে তারা বেঁচে গেছে এবং তারা আজকের সুসভ্য মানুষে পরিণত হয়েছে।

ডঃ গোভার এক নতুন থিওরি শুনলেন। মানুষের সৃষ্টি সম্বন্ধে তিনি যা জানেন তার সঙ্গে লিডান পরিবেশিত থিওরি মেলে না।

লিডানের বলার উদ্দেশ্য যে আমাদের সকলেরই জন্ম একই সূত্রে, বিভিন্ন গ্রহে বাস করলেও আমরা মানুষ অতএব আমাদের মধ্যে

ঝগড়া বিবাদ কেন থাকবে? আমাদের গ্রহে আমাদের মধ্যে কোনো বিবাদ নেই, আমরা সকলেই সন্তুষ্ট তার প্রধান কারণ আমাদের চাহিদা অপেক্ষা এই গ্রহে ভোগ্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

একটু থেমে লিডান বললেন: কিন্তু আমরা যুদ্ধ না চাইলে কি হবে? আমরা শান্তিতে বাস করতে চাইলে কি হবে? আমাদের শত্রু দেখা দিয়েছে?

—কি রকম শত্রু? কোনো জন্তু? কোনো রোগব্যাধি? ডঃ গোভার জিজ্ঞাসা করেন।

—না, না, ওসব কিছু নয়, আমাদের এখানে কোনো হিংস্র জন্তু নেই, রোগব্যাধি যা আছে তার ওষুধও আমাদের জানা আছে, লিডান বলে।

—তবে কি? কারা বা কে সেই শত্রু?

—অন্য একটি গ্রহের জীব, তাদের আমরা উলফেরেন বলি, সেই গ্রহের নাম উলফার, আমরা ঐ নাম দিয়েছি।

—তারা কি করে?

—তাদের স্পেসশিপ আছে, দেখতে গাছের গুঁড়ির মতো, তারা সেই স্পেসশিপে চেপে আমাদের গ্রহে এসে আমাদের মানুষ ও পশু ধরে নিয়ে যায়। তাদের গ্রহে খাদ্যের অভাব, আমাদের মানুষ ও পশু তারা খায়। এরকম আর কিছুদিন চললে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

—তোমরা তাদের সঙ্গে লড়াই কর না?

—আমরা শান্তিতে বিশ্বাসী, নিজেদের মধ্যেই আমরা মারামারি করি না এইজন্যে আমরা যুদ্ধ করি না, তোমাদের মতো আমাদের অস্ত্র নেই।

—কিন্তু বিজ্ঞানে তো তোমরা আমাদের চেয়ে উন্নত, কোনো মারণাস্ত্র তৈরি করতে পার নি?

—না পারি নি।

—উলফেরেনরা কেমন দেখতে? মানুষের মতো?

—প্রায়, তাদের হাত ভীষণ লম্বা, আমাদের চেয়ে মাথা অনেক লম্বা, গায়ে ভীষণ জোর, দাঁত ভীষণ ধারালো।

—ওদের যখন স্পেসশিপ আছে তাহলে ওরাও তো বিজ্ঞানে উন্নত তবে তারা তোমাদের আক্রমণ করে কেন?

—সে কথা আমি বলতে পারব না।

—তা তাদের ঠেকাবার জন্যে তোমরা কি কিছু কর?

—করছি কিন্তু এখন তো জানলুম তাতে তোমাদের ক্ষতি হচ্ছে।

—বুঝেছি, ঐ আলট্রা শর্ট ওয়েভ পাঠিয়ে ওদের মস্তিষ্ক বিকল করবার চেষ্টা করছ?

—শুধু মস্তিষ্ক নয় ওদের স্পেসশিপের কলকব্জা।

—কতদূর সফল হয়েছ? একটুও নয়।

—তাহলে কি করবে? উলফেরেনদের হাতে মার খাবে?

—তোমরা যদি আমাদের সাহায্য কর তাহলে আমরা উল-ফেরেনদের হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি।

—কি রকম সাহায্য।

—শুনেছি তোমরা নানারকম মারণাস্ত্র তৈরি করতে পার, আমাদের যদি কয়েকটা তৈরি করতে শিখিয়ে দাও তো আমরা তৈরি করে নিতে পারব। তোমাদের অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আমি তোমাদের পৃথিবীতে আমাদের আকাশযান অনেকবার পাঠিয়েছি কিন্তু কিছুই সংগ্রহ করা যায় নি, লিডান বলল।

—তার কারণ আমরা তোমাদের আকাশযানগুলি ভয়ের চোখে দেখে এসেছি এবং তোমাদের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ হয় নি, যদি কারও সঙ্গে যোগাযোগ হয়েও থাকে ভাষা প্রধান বাধা, কেউ কারও ভাষা জানি না।

—এসব অসুবিধা ও বাধা আমরা জানি।

—আচ্ছা ঐ যে দলে দলে উলফেরেনরা আসে ওদের কোনো অস্ত্র আছে ?

—অস্ত্র ? না, তবে ওদের হাতে বড় বড় লাঠি থাকে। সেই লাঠি দিয়ে প্রচণ্ড জোরে আমাদের আঘাত করে।

—তাহলে স্পেসশিপ তৈরি করলেও ওরাও কোনো অস্ত্র তৈরি করতে পারে নি, ওদেরও অসুবিধে আছে।

—তা আমি জানি না, লিডান বলল।

—লিডান এখন প্রশ্ন, হচ্ছে, যে আমি ও আমার বন্ধু টেড মিলার তোমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত কিন্তু যে সব মালমশলা দিয়ে আমরা অস্ত্র তৈরি করি তা তোমাদের আছে কিনা আমি জানি না, সে রকম মালমশলা পেলে অবশ্যই তৈরী করতে পারব আর না থাকলে তোমাদের কি আছে দেখলে চেষ্টা করতে পারি।

—আজ তোমরা বিশ্রাম নাও, আমাদের কি সম্পদ আছে, আমাদের কারখানা ইত্যাদি তোমাদের কাল দেখাব।

—দেখিও, একটা প্রশ্ন, উলফেরেনরা শেষ কবে আক্রমণ করেছিল ?

—আমাদের দিনরাত্রি পৃথিবীর দিনরাত্রি অপেক্ষা অনেক ছোট, আমাদের হিসেব অনুসারে চল্লিশ দিন আগে।

—আবার কবে আক্রমণ আশংকা করছ।

—ঠিক নেই, কালই আমি ওদের গ্রহে গুপ্তচর পাঠাব, দেখি তারা কিছু খবর আনতে পারে কিনা।

ইতিমধ্যে একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে।

লিডানের পরামর্শদাতা টেড মিলারের সামনে বসেছিল। সে টেডের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখছিল। টেড ও তার দিকেই তাকিয়েছিল। পরস্পরের সঙ্গে তারা দৃষ্টি বিনিময় করছিল।

টেডের হটাৎ মনে হল মানুষটি যেন নীরব ভাষায় তার সঙ্গে কথা বলছে। এই কি টেলিপ্যাথি ? এর দ্বারাই পরস্পরের সঙ্গে বাক্য

বিনিময় করা যায়?

সেই মানুষ যেন বলল তার নাম টোগো। আমাদের গ্রহের হিসেব অনুসারে আমার বয়স পঞ্চাশ। তোমার নাম কি? বয়স কত?

আমার নাম টেড মিলার। আমার বয়স পৃথিবীর হিসেব অনুসারে চল্লিশ।

এইভাবে দুজনে অনেক কথা হ'ল। দুজনে নীরবে কথা বলতে লাগল। নিউটন যন্ত্র ছাড়াই তো দুজনে এখন কথা বলতে পারবে।

ওদিকে তখন ডঃ গোভার লিডানকে বুঝিয়ে বলছেন তাদের গ্রহ থেকে প্রেরিত আলট্রা শর্ট ওয়েভ পৃথিবীর মানুষদের কি ক্ষতি করছে। এই রকম চলতে থাকলে পৃথিবীর মানুষ পঙ্গু হয়ে যাবে, মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটবে। ওটা এখনই বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হোক। বলতে কি এই বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্যেই এই গ্রহে আসা।

তারপর ডঃ গোভার বললেন যে তিনি এথিরিয়াতে আসবার জন্য নিজেই একটা স্পেসশিপ তৈরি করছিলেন কিন্তু ভাগ্যক্রমে তোমাদের ফ্লাইং সসার পৃথিবীতে নেমে তাঁকে নিয়ে আসায় তাঁর পক্ষে কাজটা এখন সহজ হয়ে গেল।

লিডান তখন তার পরামর্শদাতা টোগোর সঙ্গে নিজেদের ভাষায় কিছু পরামর্শ করল। তারপর বলল।

কিন্তু বন্ধু গোভার আমি ঐ আলট্রা শর্ট ওয়েভ এই মুহূর্তে বন্ধ করতে পারছি না।

অসুবিধে কি?

অসুবিধের কথা নয়, অনুমতি চাই।

কার অনুমতি? তোমার অন্যান্য মন্ত্রীদের? গোভার জিজ্ঞাসা করল।

না, আমার মন্ত্রী এই একজনই। অনুমতি নিতে হবে আমাদের

প্রধান লিডানের। এই গ্রহ চারটি দেশে বা রাষ্ট্রে বিভক্ত। প্রতি দেশের একজন করে লিডান আর এই চারজন লিডানের ওপর আছে একজন প্রধান লিডান

বুঝেছি তোমাকে সেই প্রধান লিডানের অনুমতি নিতে হবে। আজ এখনি তাঁর অনুমতি নেওয়া যায় না? কারণ আমি বেশ কিছু দিন হল পৃথিবী ছেড়ে এসেছি, ইতিমধ্যে তোমাদের প্রেরিত শর্ট ওয়েভ আমাদের মানুষদের কি ক্ষতি করেছে আমি জানি না, একবার চেষ্টা করে দেখনা যদি আজই কিছু করতে পার।

লিডান উঠে দাঁড়াল। ইয়ারফোন খুলে গোভারের হাতে দিয়ে সঙ্গে যেতে বলল।

লিডান আগে আগে চলল। নিউটন যন্ত্র হাতে নিয়ে ডঃ গোভার তাকে অনুসরণ করে চলল।

পৃথিবী থেকে যে দুজন মানুষ এথিরিয়াতে এসেছে এ খবর কিন্তু প্রধান লিডানের কাছে পৌছে গেছে। যদিও ঐ দুজন মানুষ এরিথিয়ানদের ফ্লাইং সসারে এসেছে অথবা এরিথিয়ান মহাকাশচারীরা তাদের আকাশযানে ঐ মানুষ দুজনকে নিয়ে এসেছে তাদের উদ্দেশ্য ভাল, তারা এরিথিয়ানদের কোনো ক্ষতি করবে না।

লিডান এগিয়ে চলেছে। গোভার তাকে অনুসরণ করেছ। ঘরের পর ঘর পার হচ্ছে। ঘরের কোনো দরজা নেই তবে প্রতি পথের মাথায় একটা করে চিহ্ন আছে।

গোভার গুণে দেখল ওরা তিনটে ঘর পার হল। তারপর একটা করিডোর। করিডোর পার হয়ে সামনে একটা বড় হল ঘর। সব ঘরে এবং করিডোরে না গরম না ঠাণ্ডা একটা তাপ রক্ষা হচ্ছে।

হল ঘরে ঢুকে গোভার দেখল দেওয়ালের গায়ে বেশ কয়েকটা যন্ত্র রয়েছে। টেলিভিসন স্ক্রীণের মতো চৌকো একটা পর্দাও দেখা দিল।

হলঘরে বেশ কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ সাদা পোশাক পরে কাজ

করছে। সকলের চেহারা প্রায় একই রকম।

লিডান একটি মহিলাকে কিছু বলল। সে তার সীট থেকে উঠে যেয়ে সেই পর্দার সামনে লিডানকে বসিয়ে দিল তারপর তার মাথায় কাল ঢাকা এলটি হেলমেট পরিয়ে দিল এবং মুখের সামনে ছোট ও গোলাকার একটা যন্ত্র আটকে দিল। মাথার হেলমেট ও মুখের সামনে গোলাকার যন্ত্রটির সঙ্গে দেওয়ালের গায়ে রক্ষিত যন্ত্রগুলির সঙ্গে তার সংযোগ করে দিল এবং একটি বোতাম কয়েকবার টিপে ছেড়ে দিল।

কোথাও একটা মৃদু আওয়াজ হল। বোধহয় দুই সেকেণ্ড। তারপর দেওয়ালে সেই পর্দায় একটা মুখ ভেসে উঠল। এই মুখের সঙ্গে লিডানের মুখের পার্থক্য অনেক। এর নাক বেশ উঁচু, দৃষ্টি তীক্ষ্ণ মাথাভর্তি কালো চুল।

ইতিহাসের বইতে গোভার আলেকজাণ্ডারের যে ছবি দেখেছে সেই ছবির সঙ্গে এ মুখের আশ্চর্য মিল আছে। এই বোধহয় প্রধান লিডান। কয়েক মিনিট পরে গোভার জানতে পারল তার অনুমান সত্য।

গোভার তখন অন্য কথা ভাবছিল। এথিরিয়ানরা বিজ্ঞানে অনেকদূর এগিয়েছে কিন্তু বাইরে তার কোনো প্রকাশ নেই। সবই বোধহয় গৃহ অভ্যন্তরে। বাইরে ওরা শুধু দেখছে ফ্লাইংসসার ও র‍্যামজেট।

এই বেতারে যে কথা বলার সময় দুই বক্তার ছবি পর্দার প্রতিফলিত হচ্ছে, এইরকম একটা কিছু করার জন্যে তারা অনেক দিন ধরে চেষ্টা করছে এখনও তো সফল হতে পারল না।

গোভার আরও লক্ষ্য করল একজন মহিলা কি লিখছে। বোধহয় গাছের ছাল বা পাতা দিয়ে তৈরি বেশ বড় বড় পৃষ্ঠা। এক একটি পৃষ্ঠা দু ফুট বাই দেড় ফুট হবে। নীল রং।

কি দিয়ে লিখছে? ফাউণ্টেন পেন? না। মেয়েটির হাতে

পেনসিলের মতো একটি লেখনী রয়েছে। মুখটি সরু। মেয়েটি সেই লেখনী দিয়ে নীল কাগজের ওপর বড় বড় কালো অক্ষরে লিখে চলেছে। কোনো রকম কালীর প্রয়োজন হচ্ছে না। হয় সেটি বল পেন জাতীয় কিছু অথবা কোনো গাছের ডাল যা থেকে রস নির্গত হয়।

মেয়েটির ডান দিকে একটি পাত্রে ঐ রকম আরও লেখনী রয়েছে এবং বাঁ দিকে নীল রঙের মোটা কাগজের স্তূপ।

গোভার সত্যিই তাজ্জব বনে গেল। এরা এত কিছু আবিষ্কার করেছে, বই বা ছাপাখানা আবিষ্কার করতে পারে নি?

ওদিকে তখন ছোট লিডান ও বড় লিডানের মধ্যে কথা শেষ হয়েছে। পর্দা থেকে বড় লিডানের মুখ অদৃশ্য। সেই মেয়েটি লিডানের মাথা থেকে হেলমেট, মুখের সামনে থেকে গোলাকার বস্তু এবং তার সংযোগ খুলে নিল।

লিডান তার আসন থেকে উঠে এল। হাসি মুখ। বলল, প্রধান লিডান রাজি হয়েছেন, আলট্রা শর্ট ওয়েভ ট্রানসমিশন তিনি বন্ধ করে দেবার এখনি নির্দেশ দিচ্ছেন। তিনি আরও বলেছেন যে তিনি তোমাদের সঙ্গে শীঘ্র দেখা করতে চান কারণ তিনি আশংকা করছেন যে উলফেরেনরা শীঘ্রই আবার হামলা করবে। সে বিষয়ে তিনি তোমাদের সঙ্গে কিছু বলতে চান।

আমি নিশ্চয় তাঁর সঙ্গে দেখা করব, উলফার গ্রহে তুমি কবে গুপ্তচর পাঠাবে এবং কবে নাগাদ তারা খবর আনতে পারবে?

আজই আমি গুপ্তচর পাঠাব। ওরা যদি ফিরতে পারে তাহলে আজ থেকে সপ্তম দিনে ওরা ফিরে আসবে, ওদের যে আকাশ-যান দেওয়া হবে সেটার গতি এক সেকেণ্ডে ৩০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে।

টেরিফিক, আমি তো ভাবতে পারছি না। আচ্ছা তোমাদের ওই হলঘরের সাজ সরঞ্জামগুলো একটু দেখতে পারি?

নিশ্চয় দেখতে পার তবে আজ নয়। কারণ আমার কর্মীরা আজ একটা নতুন কাজে ব্যস্ত আছে। এটা হল আমাদের বার্তা বিনিময়ের কেন্দ্র, এখান থেকে আমাদের গ্রহের বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে বার্তা আদান প্রদান হয়। কালও হবে কারণ কাল তোমাকে আমাদের কারখানা এবং খনিজ ও অন্যান্য সম্পদের নমুনা দেখাতে নিয়ে যাব।

ঠিক আছে, তুমি যেমন বলবে আমি তেমনি করব।

তাছাড়া তোমরা দারুণ স্পিডে কয়েক লক্ষ মাইল স্পেস ট্র্যাভেল করে এসেছ আজ তোমরা নিশ্চয় খুব ক্লান্ত, চল আমরা এখন গল্প করি গে যাই তারপর একসঙ্গে আহার করব।

বেশ তাই চল।

ডঃ গোভার যখন লিডানের সঙ্গে বার্তা বিনিময় কেন্দ্রে ব্যস্ত ছিল সেই সময়ে দুই 'ট' অর্থাৎ টোগো ও টেড মিলার টেলিপ্যাথিযোগে কথা বলছিল।

যত সময় যায়, দুজনের বার্তা বিনিময়ও তত সহজ হয়ে পড়ে। টোগো বলল যে তাদের ভাষা সহজ। সে শিখিয়ে দেবে কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে কি কথা হচ্ছিল ?

টেড বলল ঃ তোমার ঐ উলফেরেনদের অত ভয় কর কেন ?

ওরা সাংঘাতিক জীব। আমাদের চেয়েও আরও অনেক লম্বা। এই এতটা।

টোগো যে উচ্চতা নির্দেশ করল তা প্রায় তিন ফুট হবে।

টোগো বলতে লাগল ঃ শুধু কি লম্বা। ওজনে আমাদের চার-জনের সমান। লম্বা লম্বা পা ফেলে ভীষণ জোরে ছুটতে পারে। হাতও খুব লম্বা, হাঁটু পর্যন্ত। আঙুলে বড় বড় নখ আর বড় বড় ধারালো দাঁত, সারা গা লোমে ভর্তি। মাথাগুলো বিরাট। দেখতে মানুষের মতো কিন্তু মানুষ নয়। খুব হিংস্র।

ওরা কতজন আসে ? কি করে ?

গাছের গুঁড়ির মতো মোটা আর লম্বা স্পেসশিপ আছে ওদের। সেইরকম তিন চারটে স্পেসশিপ চড়ে ওরা আসে। প্রতি শিপে পনেরো জন করে উলফেরেন থাকে। হাতে একটা করে লাঠি থাকে।

টোগো বলতে লাগল ঃ স্পেসশিপ থেকে নেমেই ওরা আমাদের তাড়া করে। ওদের সঙ্গে ছুটে আমরা পারি না। টপাটপ আমাদের ও আমাদের পশু ধরে ফেলে।

ওরা কতদিন থেকে তোমাদের গ্রহে হামলা চালাচ্ছে ?

তিন বছর হল। ওরা যদি আর দু বছর হামলা চালায় তাহলে আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব।

ওদের সঙ্গে লড়াই করবার মতো তোমরা কোনো অস্ত্র তৈরি করতে পার নি ?

অস্ত্র যে কি জিনিস তা আমরা জানি না। শুনছি তোমার সঙ্গে নাকি একটা অস্ত্র আছে।

দুটো আছে কিন্তু তুমি যেরকম বললে সেরকম পঞ্চাশ ষাটটা জন্তু এলে এইরকম দুটো অস্ত্র দিয়ে তাদের ঠেকানো যাবে না তবে আরও বড় অস্ত্র তৈরি করা যায়।

তোমরা মানে তুমি আর তোমার সঙ্গী সেরকম অস্ত্র তৈরি করতে পার ?

পারি, তবে তোমাদের দেশে কিরকম ধাতু বা মালমশলা পাওয়া যায় তা তো আমরা এখনও জানি না। তাছাড়া তোমাদের কল-কারখানাও দেখা দরকার।

দুজনে নানারকম গল্প চলল। টেড মিলার এথিরিয়া গ্রহ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করল।

লিডানের পত্নী খাবারের আয়োজন করতে অনেক আগেই উঠে গিয়েছিল।

ক্রমে অন্ধকার নেমে এল। বারান্দাও অন্ধকার হয়ে গেল। টেড ভাবছে এরা কি রাত্রে অন্ধকারেই থাকে নাকি ?

টেডের মনের কথা বোধহয় টোগো বুঝতে পেরেছিল। দেওয়ালে কয়েকটা কুলুঙ্গি ছিল। সেই সব কুলুঙ্গিতে আলো ছিল। ইলেকট্রিক কেরোসিন বা মোমবাতি নয়। একটা চৌকো বাক্সর ওপর চিমনি লাগানো আছে। চিমনির ভেতরে আছে সৌরশক্তি দ্বারা চার্জ করা চারটে সেল। বাক্সর বাইরে একটা বোতাম আছে। বোতাম টিপতেই সেই পলতে জ্বলে উঠল। ঘর আলোয় ভরে গেল। অনেকটা চাঁদের আলোর মতো।

টোগো বলল বাতাস, জল আর সৌরশক্তি দ্বারা তাদের কল-কারখানা চলে, ঘরে আলো জ্বলে, গৃহস্থালীর রান্না ও নানারকম কাজ চলে। মাঝে মাঝে সেলগুলিকে রোদে দিতে হয়।

কোথা থেকে মৃদু সঙ্গীত ভেসে আসতে লাগল। এই রকম ওরা শুনেছিল সেই ফ্লাইং সসারের ভেতরে এরা রেডিও বাজাচ্ছে নাকি ? টোগোর কাছে যে বর্ণনা শুনল তাতে এটি রেডিও বলেই মনে হল। তবে পৃথিবীতে যেমন নানারকম অনুষ্ঠান হয় এখানে তা হচ্ছে না। পালটে পালটে নানারকম সঙ্গীত হচ্ছে।

টেডের খুব ঘুম পাচ্ছে। ঘন ঘন হাই তুলছে। ডঃ গোভার কোথা গেল ? বোধহয় লিডানের সঙ্গে কথা বলছে। একটু ঘুমোতে পারলে হত।

টোগো তাকে একটা কুঠুরিতে নিয়ে গেল। সেই কুঠুরিতে একটা তক্তাপোষের ওপর চৌকো কর্কশীট পাতা রয়েছে। বালিশগুলিও কর্কশীটের। সত্যিই এগুলি কর্ক গাদ কেটে তৈরি কিনা কেউ জানে না তবে এর ওপর শুতে ওর কোনো অসুবিধে হল না। শোওয়া মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়ল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল সে বলতে পারে না তবে ঘণ্টা দুই হবে বোধ হয়। একটি বালক তার গায়ে হাতে দিয়ে তাকে ডাকল।

টেড উঠে বসল। বালকটির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইল। বালকটি কিছু বলল কিন্তু তার কথা টেড বুঝতে পারল না। এমন সময় সে ডঃ গোভারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। লিডানের বাড়িতে ইণ্টারকমের ব্যবস্থা আছে। গোভার বলছে।

টেড তোমার কি ঘুম ভেঙেছে তাহলে ছেলেটির সঙ্গে চলে এস, খাবার দেওয়া হয়েছে। আমরা তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

বালকটি পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে চলল।

খাবার ঘরটি বেশ বড়। টেবিলের ওপর বড় বড় পাত্রে তিন চার রকম খাদ্য ও পানীয় সাজানো রয়েছে। প্রত্যেকের সামনে একটি করে প্লেট রয়েছে। লিডান, লিডানের পত্নী, টোগো ও সেই বালকটি এক একটি চেয়ারে বসেছে। তার চেয়ারটা খালি।

টেড ঘরে ঢুকতেই ডঃ গোভার বললেন ঃ টেড ঐ দেখ সামনে কল রয়েছে, হাত মুখ ধুয়ে এস। দেওয়ালের গায়ে একটা নল দিয়ে একটা ছোট অর্ধ-গোলাকার বেসিনের মধ্যে জল পড়ছে। জল মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছে।

টেড হাত ও মুখ ধুলো। জল একটু লবণাক্ত তা নইলে পৃথিবীর জলের সঙ্গে তফাত নেই।

খাবার দেখে টেড মিলার অবাক। এশিয়াবাসীরা যে রকম রুটি খায় সেই রকম রুটি। কোনো পশুর মাংশর কারি এবং কোনো সব্জির একটা তরকারি।

রুটি দেখে গোভারও অবাক হয়েছিল। লিডানকে জিজ্ঞাসা করল তারা এখানে গমের রুটি কোথা থেকে পেল ?

লিডান বলল তাদের একজন মহাকাশচারী পৃথিবীতে অনেকবার যাওয়া আসা করেছিল। একটা অঞ্চলেই সে যেত এবং বার বার যাওয়ার ফলে সে রুটি তৈরি শেখে। আড়াল থেকে সে লক্ষ করত তোমরা কি করে রুটি তৈরি কর।

তারপর সে লক্ষ্য করে কি থেকে রুটি হয়। সে এককরম গাছের

বীজ নিয়ে আসে। এখানে সে বীজ ছড়িয়ে দিতেই গাছ হয়। সে গাছের আমরা নাম জানি তবে সেই মহাকাশচারী বলে দিল যে এই গাছ তোমাদের পৃথিবী অপেক্ষা আমাদের গ্রহে আরও ভালভাবে জন্মাচ্ছে।

গোভার বলল ঃ সে গাছের নাম হল হুইট। পৃথিবীর প্রধান খাদ্য হল এই হুইট আর রাইস।

গোভার লিডানের সঙ্গে কথা বলছে নিউটন যন্ত্র মারফত। পন্টুও মাঝে মাঝে লিডানের মারফত গোভারের সঙ্গে কথা বলছিল কিন্তু টেড আর টোগোর অসুবিধে হচ্ছিল না। তারা তো টেলিপ্যাথিতেই কথা বলছিল। বালকটি হল লিডানের একমাত্র পুত্র।

লিডান বলছিল যে সে বালকটিকে ডঃ গোভারের সঙ্গে পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেবে। পৃথিবীর কিছু কিছু বিদ্যা সে যেন নিয়ে আসে।

গোভার বলেছিল পৃথিবীতে অনেক জটিলতা। কি দরকার। তোমরা তো বেশ শান্তিতেই আছো এবং তোমাদের যা আছে তাতেই তো তোমরা সন্তুষ্ট।

হ্যাঁ আমরা এতদিন বেশ শান্তিতেই ছিলুম কিন্তু আমরা এখন ঐ উলফেরেনদের ভয়ে ভীত।

তাদের সঙ্গে লড়াই করবার মতো তোমরা যদি অস্ত্র তৈরি করতে পার তো তাহলে আর তোমাদের ভয়টা কিসের।

দেখ তোমরা যদি সেরকম অস্ত্র তৈরি করে দিতে পার।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট শেষ হতে না হতেই চারখানা র‍্যাম-জেট এসে হাজির।

লিডান বলল ঃ তাহলে চলুন ডঃ গোভার আপনাকে সব দেখিয়ে আনি।

বেশ চলুন।

ডক্টর গোভার সঙ্গে নিলেন নিউটন যন্ত্রটি। নিজের ডায়েরি ও পেনসিল। ডায়েরিতে তিনি সব কিছু নোট করছেন, স্কেচ করছেন, টুকিটাকিও কিছু লিখছেন।

সকলে নিজ নিজ র‍্যামজেটে উঠে বসল। আগে চলল লিডান, তারপর ডঃ গোভার ও টেড মিলার এবং সব শেষে টোগো।

ডঃ গোভার স্থির করলেন এবার পৃথিবীতে ফিরে তিনি একটা র‍্যামজেট তৈরি করবেন। যাওয়া আসার খুব সুবিধে। খরচ ও বেশি নয়। একমাত্র সমস্যা হল ফুয়েলের। এথিরিয়ানদের ফুয়েল সমস্যা নেই।

সেই ফুয়েল কোথায় পাওয়া যায় সেটিও ডঃ গোভার দেখবেন। এই ফুয়েল সম্বন্ধে তাঁর দারুণ কৌতূহল।

যে পাহাড়ে লিডানের বাড়ি সেই পাহাড় অতিক্রম করে গোভার ও টেড দেখল সুন্দর একটা উপত্যকা, চারিদিকে সবুজে সবুজ। পাঁচ মাইল ব্যাস হবে এ·ন একটা গোলাকার উপত্যকা, চারদিকে পাহাড় ঘেরা।

সেই উপত্যকার মাঝখানে টলটলে নীল জলের একটি হ্রদ। হ্রদের মাঝখানে একটি গোলাকার দ্বীপ। দ্বীপে নানারকম গাছ, গাছে নানা রকম রকম রঙের অজস্র ফুল ফুটে রয়েছে।

হ্রদটি ঘিরে অনেক বাড়ি।

লিডান বলল : এই হল আমাদের শিল্প নগরী। এইবার আমরা নামব, আসুন।

একটা ফাঁকা জায়গায় লিডান নেমে পড়ল। লিডানকে অনুসরণ করে বাকি তিনজনও নেমে পড়ল। ওপর থেকে মনে হয়েছিল জায়গাটা বুঝি ঘাসে ঢাকা। নীচে নেমে গোভার দেখল, ঘাস নয়, জমিটা সবুজ রং করা।

লিডান বলল : আগে আমাদের সংগ্রহশালায় চল। আমাদের গ্রহের সমস্ত সম্পদ, তাদের বিবরণী এবং তা থেকে আমরা কি

পেয়েছি বা সেগুলি আমরা কি ভাবে ব্যবহার করি তা সব লেখা আছে।

কিন্তু আমি তো তোমাদের ভাষা পড়তে পারি না, গোভার বলল।

আমি বুঝিয়ে দেব, লিডান উত্তর দিল।

সংগ্রহশালা দেখে গোভার অবাক। এই গ্রহে কি কি খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, কি কি ধাতু তৈরি হয় কাঠ, তন্তু, উদ্ভিজ রসায়ণ সব রকমের জিনিসের নমুনা, ব্যবহার, উৎপাদিত সামগ্রী সব কিছুর নমুনা ও তথ্যাদি দেওয়া আছে।

ডক্টর গোভার অনুসন্ধান করতে লাগলেন আপাততঃ স্টেনগান, লাইট মেসিন গান, রাইফেল, পিস্তল এবং হ্যাণ্ড গ্রেনেড এবং সাধারণ হাত বোমা তৈরির উপাদান এই গ্রহে পাওয়া যাবে কিনা।

গোভার নিরাশ হলেন না। তিনি দেখলেন যে সব রকম উপাদানই আছে। তারপর তিনি ভাবলেন যে যারা ফ্লাইং সসার বা র‍্যামজেট তৈরী করতে পারে তারা নিশ্চয় মারণাস্ত্রগুলি তৈরী করতে পারবে। এদের কারখানাগুলি দেখা দরকার।

কারখানা দেখবার আগে ফ্লাইং সসার ও র‍্যামজেট চালাবার হলদে রঙের সেই চটচটে ফুয়েল সম্বন্ধে গোভার ও টেড দুজনেই আগ্রহ প্রকাশ করল।

. লিডান বলল, বেশ তাহলে চল আমরা যেখান থেকে ঐ জিনিষটা সংগ্রহ করি সেই জায়গাটা তোমাদের দেখিয়ে আনি।

আবার ওরা সকলে র‍্যামজেটে চেপে বসল। শিল্পনগরী ঘেরা পাহাড় অতিক্রম করে ওরা বেশ নীচু দিয়ে উড়ে চলল। বোধহয় তিনশ' ফুট উঁচু দিয়ে।

র‍্যামজেট বেশ জোরে চলেছে। সোজাপথে মাইল কুড়ি অতিক্রম করার পর গোভার ও টেড একটা তীব্র গন্ধ পেল। গন্ধটা যে কিসের তা তারা বলতে পারল না। এরকম গন্ধ তারা আগে

কখনও পায় নি।

লিডান একটা পাহাড়ের ধারে নামল। এই পাহাড়ে কোনো গাছ নেই। চারদিকে হলদে রঙের পাথর। সামনে বিশাল খাদ, আর সেই খাদ সেই হলদে রঙের চটচটে পদার্থে পূর্ণ। তীব্র গন্ধ নাকে লাগছে। সহ্য করা মুশকিল।

গোভার বলল, লিডান চল আমার আপাততঃ দেখা হয়েছে, পরে এ বিষয়ে আমি আরও খোঁজ খবর নোব, এখন আমাকে তোমাদের শিল্প-নগরীতে আবার নিয়ে চল। তোমাদের কারখানা দেখব।

যন্ত্রপাতি, এঞ্জিন, ট্রান্সমিটার ইত্যাদি তৈরি হয় এমন কয়েকটি কারখানা গোভারকে লিডান দেখাল। কারখানা দেখে গোভার ও টেড সন্তুষ্ট এই সব কারখানার অস্ত্রগুলি তৈরি করা যাবে এমন কি গ্রেনেড, হাতবোমা ও বিভিন্ন বুলেটও তৈরি করা যাবে।

গোভার ও টেড সেই দিনই কাজে লেগে গেল। ওদের গ্রহের স্কেল অনুসারে প্রথমে নকশা তৈরি হল। তারপর নিউটন যন্ত্রের সাহায্যে একজন এঞ্জিনিয়ারকে গোভার সব কিছু বুঝিয়ে দিল।

এঞ্জিনিয়ার বলল তোমরা যে পদ্ধতির কথা লিখেছ কয়েকটি জায়গায় আমি ঠিক অনুমান করতে পারছি না তবে আমি অস্ত্র ঠিক তৈরি করে দোব কারণ তোমরা যে যন্ত্র বা নাট বল্টু ইত্যাদি ব্যবহার কর তা আমাদের নেই, না থাকলেও কোনো অসুবিধে হবে না, এঞ্জিনিয়ার বলল।

নকশা নিয়ে এঞ্জিনিয়ার চলে গেল। বলে গেল প্রথমে প্রতিটি অস্ত্রের একটি করে নমুনা আগে দেখিয়ে নেবে। তবে গোভার ও টেড কারখানায় তাদের সঙ্গে থাকলে ভাল হয়'

গোভার ও টেড রাজি।

সেদিন বিকেলে লিডানকে গোভার প্রশ্ন করল ঃ উলফেরেনদের

আক্রমণ তুমি আবার কবে আশংকা করছ।

সেটা আমাদের প্রধান লিডান বলতে পারবেন।

তাঁর সঙ্গে তো আমাদের দেখা করিয়ে দিলে না, গোভার বলল।

তাহলে কালই সকালে চল, তার আগে আমি জেনে আসি কাল তাঁর সময় হবে কি না।

বার্তা বিনিময় কেন্দ্র থেকে ফিরে এসে লিডান বলল, হ্যাঁ কাল তাঁর সময় হবে, আমরা কাল সকালেই যাব, কাল যাওয়া আসা ও প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে আমাদের সারা দিনই লাগবে।

তা লাগুক, আমরা একদিন কারখানায় না গেলেও অসুবিধে হবে না। তুমি যে গুপ্তচর পাঠিয়েছিলে তাদের ফেরবার সময় হয়েছে কি? গোভার জিজ্ঞাসা করল।

লিডান উত্তর দিল, আজ তো পাঁচ দিন হল, সাতদিনের দিন যে কোনো সময় ওরা ফিরে আসবে।

আমার আর একটা প্রশ্ন আছে লিডান।

কি প্রশ্ন?

গুরুতর কিছু নয়, সাধারণ প্রশ্ন, উলফার গ্রহের ঐ উল-ফেরেনরা যখন আসে তখন কি আগে তোমার কোনো সংকেত পাও? সতর্ক হবার কি সময় পাও? তোমাদের গ্রহের কোথায় তারা অবতরণ করে?

একটা প্রশ্ন কোথায়? এ তো তুমি অনেকগুলো প্রশ্ন করলে, আমি একে একে জবাব দিচ্ছি, না ওরা কবে, কখন বা কোথায় আসবে তা আমরা জানতে পারি না, সতর্ক হবারও সময় পাই না। ওরা আমাদের গ্রহের কাছাকাছি এসে ওদের স্পেসশিপ দেখতে পাই তবে ওরা প্রচণ্ড গতিতে আসে এবং নেমেই আমাদের আক্রমণ করে। বলতে গেলে ওদের আক্রমণ ঠেকাবার আমরা সময় পাই না তাছাড়া ওদের সঙ্গে ছুটেও আমরা পারি না।

কিছুক্ষণ থেমে লিডান বলল, তবে একটা কাজ আমরা করি,

ওরা আমাদের গ্রহে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শিল্প-নগরকে আমরা সতর্ক করে নিই, কর্মীরা তৎক্ষণাৎ মাটির নীচে ঘরে লুকিয়ে পড়ে তবে শিল্পনগরীর দিকে উলফেরেনদের এখনও নজর পড়েনি।

তার কারণ ওখানে ওদের স্পেসশিপ ল্যাণ্ড করার উপযুক্ত জায়গা নেই বোধহয়।

ঠিক বলেছ, এটা তো আমার খেয়াল হয়নি।

ঠিক আছে, আমি তোমাদের একটা যন্ত্র তৈরি করে দিচ্ছি, সেই যন্ত্রে একটা পর্দা থাকবে, সেই পর্দায় ওদের স্পেসশিপ ছায়া পড়বে, সেই ছায়া দেখে তোমরা সতর্ক হবার সময় পাবে।

কতটা সময় পাব ?

তুমি তো বললে ওরা প্রচণ্ড গতিতে আসে, আমাদের হিসেবে সেকেণ্ডে আড়াইশ' মাইল, তা যদি হয় তাহলে তোমাদের সময় অনুসারে পুরো এক দিন সময় পাব, কাল প্রধানের সঙ্গে দেখা করে এসে পরের দিন কাজে হাত দোব আর সেইদিন তো তোমার গুপ্ত-চরেরা ফিরে আসছে।

প্রধান লিডানের সঙ্গে লিডানের কোনো পার্থক্য নেই। পার্থক্য হল পোশাকে। প্রধান লিডানের পোশাকের রং হলদে। তাঁর বাড়িটাও হলদে রঙের।

প্রধান লিডানের বাড়ি বেশ দূরে! পৌছতে তিন ঘন্টা লাগল। র‍্যামজেটে চড়ার অভ্যাস গোভার বা টেডের নেই, বেশ অসুবিধা হচ্ছিল তাই মাঝে মাঝে নেমে ওরা বিশ্রাম নিচ্ছিল।

লিডান ওদের এমন জায়গায় নামাচ্ছিল যেখানে সেই পানীয় পাওয়া যায়। টোগো সেই পানীয় নিয়ে আসছিল। পানীয় শেষ

করে ক্লান্তি দূর করে আবার র‍্যামজেটে উঠে বসছিল। পথে ওরা দুবার অবতরণ করেছিল।

প্রধান লিডান ওদের সাদরে আহ্বান করে নিলেন। আদর আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি হল না। তিনি বললেন যে ফ্লাইং সসারে চেপে তিনি পৃথিবীতে তিন বার গিয়েছিলেন কিন্তু কোনবারই পৃথিবী তাঁর ভাল লাগেনি। তাঁব যেন দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল পৃথিবীতে নেমে। তিনি লক্ষ্য করেছেন যে পৃথিবীতে শান্তি নেই মানুষে মানুষে বড় বেশি শত্রুতা।

এখানেও সেই একই ধরণের পাতে একই রকম আহার ও পানীয় পরিবেশিত হল। প্রধান লিডানও তাই খেলেন। কোনো তফাত নেই। গোভার ও টেডের বেশ ভাল লাগল। পৃথিবীতে যদি এমন হত তাহলে তারা কি সুখেই না বাস করত।

এক সময় গোভার প্রশ্ন করল, উলফেরেনদের আক্রমণ তিনি আবার কবে আশংকা করছেন? আমি সেইটে জানতেই এসেছি তবে যদি দীর্ঘদিন হয় তাহলে তাদের পক্ষে প্রতীক্ষা করা অসুবিধে হবে। তাদের আবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে হবে তো। পৃথিবীর বন্ধুরা নিশ্চয়ই তাদের জন্য চিন্তিত। আর আক্রমণের সময় যদি কম থাকে তাহলে অস্ত্রগুলি দ্রুত তৈরি করাতে হবে এবং এথিরিয়ার যোদ্ধাদের তাদের ব্যবহার শিখিয়ে দিতে হবে।

প্রধান লিডান বললেন যে আজ থেকে ঠিক পনেরো দিন পরে তিনি আক্রমণ আশংকা করছেন। কেন পনেরো দিন পরে তা তিনি বলতে পারবেন না তবে পূর্বেও তাঁর এরকম আশংকা সত্যে পরিণত হয়েছে।

তাহলে তাদের হাতে এই পনেরো দিন আছে। সময় খুব কম। তাই গোভার মনে মনে ঠিক করল যে আগে বেশ কিছু হাতবোমা ও গ্রেনেড তৈরি করিয়ে রাখবে। পনেরো দিনের মধ্যে যদি অস্ত্র তৈরি সম্ভব না হয় বা. যোদ্ধাদের ট্রেনিং দিয়ে না উঠতে পারে তাহলে

উলফেরেনদের তো ঠেকাতে হবে।

গোভার অবিশ্যি আরও একটা কথা ভেবেছিল। এই উলফেরেনরা সাংঘাতিক জীব। এরা এখানে বাধা পেলে কোনদিন হয় তো পৃথিবী আক্রমণ করবে।

একটা আশার কথা যে ওদের নখ আর দাঁত আর বাহুবল ছাড়া কোনো অস্ত্র নেই। এক্ষেত্রে তারা পৃথিবীর সঙ্গে পারবে না। তবে ওদের কত স্পেসসিপ আছে, ওদের সংখ্যাই বা কত তা জানা নেই।

ওরা জানে যে এথিরিয়ানদের ওরা সহজেই কাবু করতে পারে যদি কোনো অস্ত্র থাকে তাহলে সে কেমন তার পরিচয় পাওয়া যায় নি।

গোভার ও টেডের ইচ্ছে যে ওরা উলফেরেনদের রীতিমতো একটা ঘা দিয়ে যাবে যাতে ওরা আর এথিবিয়া কেন কোনো গ্রহের ওপর চড়াও হতে সাহস না করে।

ফেরবার আগে আরও কিছু কথা হল। যেমন উলফেরেনরা কি প্রতিবার একই জায়গায় অবতরণ করে ?

প্রধান লিডান বললেন যে তিনটি জায়গা আছে, ওরা সেই তিনটির মধ্যে কোনো একটিতে অবতরণ করে। কোনটায় নামবে আগে বলা যায় না।

তিনি বললেন যে টোগো সেই তিনটে জায়গা আপনাদের দেখিয়ে দেবে। দেখে রাখা তো দরকার কারণ সেই বুঝে রণকৌশল তৈরি করতে হবে।

কথাবার্তা শেষ হল। প্রধান লিডান ওদের কিছু উপহার দিলেন। একটা পোশাক দিলেন। বললেন এই পোশাকের গুন গ্রীষ্মে দেহ শীতল রাখবে আর শীতে দেহ উষ্ণ রাখবে।

গোভার বলল ঃ প্রধান লিডান, আপনাকে আমি একটি অনুরোধ করব। উলফেরেনদের সঙ্গে আপনাদের লড়াই শেষ হয়ে

যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি যোদ্ধার কাছ থেকে প্রতিটি অস্ত্র আপনি নিশ্চয়ই ফিরিয়ে নেবেন। কারও কাছে যদি অস্ত্র থেকে যায় তাহলে তা হবে বিপজ্জনক। আপনার গ্রহে শান্তি বিঘ্নিত হবে। এই নিয়ম আপনি কঠোরভাবে পালন করবেন।

ধন্যবাদ, আমি তো এরকম ভেবে দেখি নি। আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে তাই বলতে পারলেন।

অবশেষে ওরা চারজন বিদায় নিল। নিজেদের এলাকায় পৌঁছবার একটু পরেই ওরা খবর পেল যে উলফার গ্রহে যে গুপ্তচর পাঠান হয়েছিল তারা ফিরে এসেছে।

একটু বিশ্রাম নেবার পর গুপ্তচরদের ডেকে পাঠান হল।

গুপ্তচরেরা তখনও ক্লান্ত। প্রচণ্ড গতিতে কয়েক লক্ষ মাইল অতিক্রম করে এসেছে। ক্লান্ত তো হবেই।

ওদের কিছু কড়া পানীয় এবং ওষুধ খাইয়ে খাড়া করা হয়েছে।

তাড়াতাড়ি করার কারণ হাতে তো আর সময় নেই।

তিনজন চর গিয়েছিল। মূল যে পর্যবেক্ষক তাকেই ডেকে পাঠান হল। সে এসে বলল যে উলফেরেনরা এবার যেন তোড়জোড় একটু বেশি পরিমাণেই করছে। ওরা তো সমগ্র উলফার গ্রহটা অতিক্রম করতে পারে না। তবে যেখানে ওদের স্পেসশিপ তৈরী হয় এবং যেখান থেকে ওরা এথিরিয়ার জন্য যাত্রা আরম্ভ করে সেই অঞ্চলটা ওরা ভাল করে দেখে এসেছে।

প্রতিবার ওরা আসে তিনটে কি চারটে স্পেসশিপ চেপে। এবার মনে হল অন্ততঃ ছয়টা স্পেসশিপ রেডি করা হচ্ছে।

লিডান জিজ্ঞাসা করল ওরা কোনো অস্ত্র তৈরি করছে কিনা জানতে পারলে কি?

না, সেরকম কিছু দেখি নি বা বুঝতে পারি নি। অস্ত্র থাকলেও ওরা তো অস্ত্র আনে না, কারণ বিনা অস্ত্রেই ওরা আমাদের পরাজিত করে।

ঠিকই বলেছ, তা কবে নাগাদ ওরা আসতে পারে ? কিছু আভাস পেলে ? কিছু বলতে পার ?

মনে তো হল শীঘ্র তবে দিন পনেরোর মাথায় আসবে বলে মনে হচ্ছে।

কি করে বুঝলে ?

ওরা আমাদের গ্রহ থেকে যে সব পশুগুলো ধরে নিয়ে গিয়ে যেখানে রাখে সেখানে পশুর সংখ্যা যা দেখে এলুম এবং যে পরিমাণে ওরা পশু খায় তার ওপর নির্ভর করে বলছি আর কি ?

আর আমাদের গ্রহের মানুষ দেখলে কি ?

এবার মানুষ দেখতে পাই নি, তাদের বোধহয় আগেই খেয়ে শেষ করেছে, সেই চর বলল।

এরপর গোভার কয়েকটা প্রশ্ন করল। চর সেগুলির জবাব দিল।

গোভার হিসেব করল ছয়টা স্পেসশিপ যদি আসে তাহলে অন্ততঃ নব্বুইটা দৈত্য বা উলফেরেন আসবে। ওদের দৈত্য বলাই ভাল। যাই হোক সেইভাবে তৈরী হতে হবে।

ওরা যদি একই স্থানে একই সঙ্গে অবতরণ করে কিংবা যদি পৃথক পৃথক জায়গায় অবতরণ করে তাহলে তাদের ঠেকাবার জন্যে কি ব্যবস্থা করা যেতে পারে এবিষয়ে লিডানের সঙ্গে পরামর্শ হল।

একই স্থানে নামলে প্রতিরোধ করা সহজ হবে কিন্তু পৃথক পৃথক স্থানে নামলে সেখানে দ্রুত কিভাবে যোদ্ধা পাঠান যাবে সে বিষয়ে আলোচনা হল।

যোদ্ধা এথিরিয়ানদের অধিনায়ককে ডেকে পাঠান হল। কত-জন যোদ্ধা আছে। তারা কোথায় থাকে। ঘটনাস্থলে তাদের দ্রুত কিভাবে পাঠান যেতে পারে ইত্যাদি অধিনায়ককে জিজ্ঞাসা করল।

অধিনায়ক বলল যে আগে অস্ত্রগুলি তৈরি হয়ে যাক। তারপর সেই অস্ত্রের ব্যবহার যোদ্ধাদের শেখান হবে। শেখবার পর কয়েকবার মহড়াও দিতে হবে।

নিশ্চয় এসব তো করতেই হবে, লিডান বলল।

আমি পাঁচশ জন যোদ্ধা তৈরি রাখতে চাই, সেই পরিমাণ অস্ত্র আমার চাই।

বেশ তাই দেওয়া হবে, তারপর।

উলফেরেনরা যে সব জায়গায় মানে প্রধানতঃ তিনটে জায়গায় ওরা অবতরণ করে কারণ এই তিনটে জায়গাতেই আমাদের পশু ও মানুষের সংখ্যা বেশি আছে। আমরা আগে থেকে ঐ তিন জায়গায় আমাদের যোদ্ধা মোতায়েন রাখব।

বেশ ভাল এবং কিছু রিজার্ভ রাখা হবে। লিডান বলল!

সে তো নিশ্চয়। যাক এবার দেখা যাক আমাদের পৃথিবীর বন্ধুদের সহায়তায় দানবদের আমরা এমন শিক্ষা দিতে পারি কি না যাতে ওরা আমাদের গ্রহে আসতে আর সাহস না পায়।

টেড বলল, পরে আসবে কি না বলতে পারি না তবে এবার যারা আসবে তাদের আর ফিরে যেতে হবে না।

লিডান বলল, সম্ভাব্য স্থানে তুমি তো যোদ্ধা মোতায়েন রাখবে কিন্তু প্রয়োজন হলে রিজার্ভ বাহিনী থেকে যাতে দ্রুত যোদ্ধা পাঠানো যায় তার কি ব্যবস্থা করবে।

তার ব্যবস্থা আমি ইতিমধ্যে করে রাখব। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

চর তো আগেই বিদায় নিয়েছিল এবার অধিনায়কও চলে গেল।

লিডান বলল, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি অধিনায়কদের ওপর নির্ভর করতে পারি।

তা পার কিন্তু আমার সমস্যা হল যে পাঁচশ' জন যোদ্ধার উপযোগী অস্ত্র দশ দিনের মধ্যে আমার চাই, অবিশ্যি পাঁচশ' জনের জন্যে পাঁচশটি অস্ত্র না হলেও চলবে, একশ' জন দৈত্যকে ঠেকাবার জন্যে অস্ত্র চাই, গোভার বলল।

টেড বলল তাহলে তিনটে জায়গার জন্যে অন্ততঃ চারটে করে

মেসিন গান আর শ' পাঁচেক বোমা আগে তৈরি করা হোক। তাহলেই কাজ উদ্ধার হবে।

ঠিক বলেছ, তাহলে আমরা পনেরোটা মেসিন গান তৈরি করাই। বাড়তি তিনটে রিজার্ভ বাহিনীর কাছে থাকবে, গোভার বলল।

ইতিমধ্যে কিন্তু আমাদের রাডারটাও তৈরি করে ফেলতে হবে।

জরুরী পরিস্থিতির জন্য ডঃ রিচার্ড গোভার এবং টেড মিলারের শিল্প নগরীতে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে ডক্টর গোভার তাঁর নিউটন যন্ত্রটি সঙ্গে নিয়েছেন কিন্তু ডক্টর নিজে এবং ওদের এঞ্জিনিয়ার উভয়েই অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাই ইতিমধ্যে দুজনে দুজনের ভাষা কিছু আয়ত্ত্ব করতে পেরেছেন।

টেড মিলার কিন্তু টোগোকে সঙ্গে রেখেছে কারণ তার সঙ্গে টেলি প্যাথির দ্বারা কাজ আরও দ্রুত হয়। গোভার লক্ষ্য করল যে এদের কারখানায় কতকগুলি কাজ খুব কম সময়ে হয়। যেমন কাঠ বা ধাতুর পাত বাঁকানো বা জোড়া দেওয়া, পৃথিবীতে যেখানে লাগে তিন ঘণ্টা এখানে লাগে মাত্র পাঁচ মিনিট।

কাঠ ও ধাতু জোড়া দেবার জন্যে এরা এমন একরকম আঠা তৈরী করতে পেরেছে যার দ্বারা কাজ করলে কাঠ তো খোলেই না, ধাতুও কিছুতে খোলা যায় না। প্রচুর তাপ দিলেও সে জোড়া খোলে না। আঠার উপাদানগুলি যে কি তা গোভার ধরতে পারেন নি কারণ সেগুলি পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

বোমা ও হ্যাণ্ড গ্রেনেড তৈরির প্রচুর উপাদান এখানে পাওয়া গেছে। বেশ কিছু হাত বোমাও গ্রেনেড তৈরিও হয়ে গেছে। ইতি-মধ্যে একশ' জন যোদ্ধাকে বোমা ছোঁড়ায় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

গোভার ও টেড লক্ষ্য করেছিল যে এথিরিয়ানদের মধ্যে সাহসের

অভাব আছে। বলতে গেলে তারা ভীতু। যুদ্ধ তো দূরের কথা নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা মারামারি কখনও করে নি অতএব ভীতু তো হবেই। তাই বোমা ছোড়া শেখাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রচণ্ড শব্দে প্রথম বোমাটি ফাটার পর যারা কাছে ছিল তারা তো পালিয়েই গিয়েছিল।

প্রথম কয়েকটা বোমা টেড মিলার ফাটিয়েছিল। ধ্বংসের পরিমাণ দেখে ওরা সত্যিই ভয় পেয়েছিল। নিজের বোমা হাতে নিতেই চায় নি। অধিনায়ক যখন সাহস করে কয়েকটা বোমা ফাটাল তখন তারা একে একে এগিয়ে এল।

দলে দলে ভাগ করে কিছু লোককে বোমা ছোঁড়ার ট্রেনিং দেওয়া হল।

মেসিন গান ও তার বুলেট এখনও তৈরী হয় নি। দু এক দিনের মধ্যেই হয়ে যাবে। তখন অন্য দলকে ট্রেনিং দেওয়া হবে।

এদিকে ডক্টর গোভার রাডার নিয়ে পড়ে আছেন। তিনি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন একটি পোর্টেবল রাডার তৈরী করছেন। যাতে অন্ততঃ দুই লক্ষ মাইল থেকে আগত বস্তু তাঁর রাডারের পর্দায় ধরা পড়ে।

ঠিক আট দিনের মাথায় কুড়িটি মেসিন গান ও তিন হাজার বোমা ও হ্যাণ্ড গ্রেনেড তৈরি হয়ে গেল। তবে তারা থেমে গেল না। আরও মেসিনগান এবং বোমা তৈরি হতে থাকল। সেই সঙ্গে মেসিন গানের বুলেট।

মহড়ার সময় বোমা ও বুলেট অনেক খরচ হবে। সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধাদের ট্রেনিং এবং মহড়াও চলছে।

পোর্টেবল রাডারও তৈরি হয়ে গেছে। লিডান একজন বিজ্ঞানী দিয়েছে। তার নামটা গোভার বা টেড উচ্চারণ করতে পারে না তাই তারা সেই বিজ্ঞানীর নাম দিয়েছে ড্যান। টোগোর মতোই ছোট নাম।

রাডার পর্দার ওপর নজর রাখা এবং সেটিকে চালনা করা ড্যান

শিখে নিয়েছে কিন্তু আরও একজনকে শেখাতে হবে কারণ রাডার স্ক্রীনের ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখতে হবে।

পরদিনই ড্যান আর একজন লোক নিয়ে এল। এর নাম দেওয়া হল এরিক। ড্যানের চেয়ে এরিক আরও বুদ্ধিমান। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে রাডার ব্যাপারটা আয়ত্ত্ব করে নিল।

পর্দার দিকে দেখতে দেখতে এরিক হঠাৎ উঠে গিয়ে নিজের ল্যাবরেটরিতে গেল। ল্যাবরেটরিতে যেয়ে কি কয়েকটা নিয়ে এসে রাডারের ভেতর লাগিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে রাডারের পর্দা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ব্যাপার দেখে তো ডঃ গোভার এবং টেড উভয়েই তাজ্জব।

বারো দিনের মাথায় সব আয়োজন প্রস্তুত। যোদ্ধাদের ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে। মেসিনগান ও বোমা সমেত সম্ভাব্য অবতরণের তিনটি স্থানে দলে দলে বিভক্ত যোদ্ধাদের মোতায়েন রাখা হয়েছে।

তিনটি জায়গায় গোভার নাম দিয়েছে এ-জোন, বি-জোন এবং সি-জোন। তিনটি জোনে মধ্যে তফাত হল পঞ্চাশ মাইল। তিনটি জোনের সঙ্গে বেতার মারফত যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। টেড, এরিক এবং ড্যান চব্বিশ ঘণ্টা রাডার স্ক্রীনের ওপর নজর রাখছে। মাঝে মাঝে ডক্টর গোভার তাদের রিলিফ দিচ্ছে।

প্রধান লিডান প্রায়ই খবর নিচ্ছেন। গোভার ও টেডের তিনি সব রকম আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

উলফেরেনদের আক্রমণ আশংকায় এবার আর ভয় নয় একটা চাপা উত্তেজনা ও কৌতূহল। নতুন রণকৌশলে কি হয়, কি হয় ?

উলফেরেনদের যদি ওরা পরাজিত করতে পারে তাহলে ওরা সুখে শান্তিতে বাস করতে পারবে।

বারো দিন পার হয়ে গেল।

এথিরিয়ানদের হিসেব অনুসারে উলফেরেনরা আর তিন দিন পরে এসে পড়তে পারে।

ইতিমধ্যে একটা কাণ্ড ঘটল।

ইচ্ছে করলে ডক্টর গোভার পৃথিবীতে একটা বার্তা পাঠাতে পারতেন।

তাঁর সলসবেরি রিসার্চ স্টেশনের একটা সাংকেতিক সংখ্যা আছে এবং বার্তা গ্রহণ ও প্রচারের জন্যে নির্দিষ্ট মাপের বেতার তরঙ্গও আছে।

তবুও ইচ্ছে করেই ডক্টর গোভার পৃথিবীতে ডক্টর হিউ নিউবেরির কাছে কোনো বার্তা পাঠান নি।

পৃথিবীর সঙ্গে আদান প্রদান হলে এবং সেটা যদি গোপন না থাকে তাহলে পৃথিবী থেকে ক্রমাগত বার্তা আসতেই থাকবে তাতে হবে কি, যে উদ্দেশ্যে তিনি এথিরিয়াতে এসেছেন তা ব্যর্থ হতে পারে এবং যে ক'দিন থাকবেন তাতে তাঁর মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। এই সব ভেবে ডক্টর গোভার পৃথিবীতে কোনো বার্তা পাঠাননি।

কিন্তু সেদিন এক আকস্মিক এক কাণ্ড ঘটল।

নিউবেরি কখন অফিসে আসে সেই সময়টা হিসেব করে ডঃ গোভার এথিরিয়াতে তার ঘরে রেডিও যন্ত্রটা খুলে রাখে।

এথিরিয়ার বার্তা বিনিময় কেন্দ্রকেও বলা আছে যে পৃথিবী থেকে কোনো মেসেজ এলে তাঁকে যেন জানানো হয়।

সেদিন বসে বসে ডঃ গোভার মনোযোগ দিয়ে ডায়েরি লিখছে। এমন সময় তার রেডিও রিসিভার সরব হয়ে উঠল, পিপ পিপ পিপ, আর্থ কলিং ডক্টর গোভার, আর্থ কলিং ডক্টর গোভার···

ডঃ গোভারের কান খাড়া হয়ে উঠল!

ডক্টর গোভার আর ইউ লিসনিং ডক্টর গোভার আপনি কি শুনছেন?

রেডিও রিসিভারের ওপর গোভার ঝুঁকে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিল।

ডক্টর রিচার্ড গোভার হিয়ার, কে? হিউ নিউবেরি?

হ্যাঁ, আপনি এখন কোথায় ?

বলব না, অন্য কেউ আমাদের ট্রানসমিশন পিক আপ করলে আমার অসুবিধে হবে, গোভার উত্তর দিল।

খুব খারাপ খবর আছে, আপনার ল্যাবরেটরি ও প্ল্যান্ট আগুন লেগে পুড়ে গেছে, সব নষ্ট হয়ে গেছে, স্যাবোটাজ আসা আশংকা করা হচ্ছে, গভর্ণমেন্ট ইনকুয়ারি কমিশন বসাবে।

সর্বনাশ ! মাই গড ! আমার সব গেল ? তাহলে আমি ও টেড যেখানে আছি সেখান থেকে আর ফিরব না।

আপনি কোথায় আছেন ? এথিরিয়াতে ?

বলব না, যা ইচ্ছে ভেবে নাও। গোভার তখন প্রায় কেঁদে ফেলেছেন।

ফিরবেন না কেন ? ফিরতে পারবেন না ?

আমি এখন কিছু বলতে পারছি না। খুব খারাপ খবর দিলেন, যা হয় পরে জানাব। হেলেন মার্টিন কেমন আছে ? তার ইমপাল-সেসিয়া।

সে সম্পূর্ণ সুস্থ, কিছু বলুন।

এখন আমার আর কিছু বলার নেই, ওভার।

সত্যিই ডঃ গোভারের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। তার আজন্মের সাধনা সব নষ্ট হয়ে গেল পৃথিবীতে ফিরে যেয়েই বা তিনি কি করবেন ? সেখানে তাঁর আর কোনো আকর্ষণ রইল না, তার চেয়ে এখানেই থেকে যাবেন ; এথিরিয়ানরা খুব উন্নত ওরাও ওকে রাখতে চায়, এখানে গবেষণার অনেক সুযোগ আছে, যদি অসাধারণ কিছু আবিষ্কার করতে পারেন যা পৃথিবীর কাজে লাগবে তখনই তিনি পৃথিবীতে ফিরবেন।

টেডকে ডেকে তিনি খবরটা দিলেন।

টেডও প্রথমে ভেঙে পড়ল কিন্তু সে তাড়াতাড়ি সামলে নিল। সামনে নতুন অ্যাডভেঞ্চার, নতুন উত্তেজনা। যে দৈত্যের দল আসছে

তারা কেমন হবে ? যুদ্ধে জিততে পারবে তো।

এছাড়া টেডের আর একটা আকর্ষণ জুটেছে। একটি এথিরিয়ান মেয়ের সঙ্গে সে জমে গেছে। মুশকিল হয়েছে কি মেয়েটির সঙ্গে টেলিপ্যাথি দ্বারা যোগাযোগ সম্ভব হচ্ছে না। রাডার থেকে ছুটি পেলে মেয়েটির কাছে যায়, ইসারায় কথা হয়।

আর দেরি করা চলে না। টোগোর কাছ থেকে এথিরিয় ভাষাটা শিখে নিতে হচ্ছে। এদের উচ্চারণগুলো বড় বেয়াড়া।

রাডার স্ক্রীনের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে ছিল এরিক।

নিজের ভাষায় হঠাৎ সে চিৎকার করে উঠল আর টোগো সেটা সঙ্গে সঙ্গে টেলিপ্যাথি করে টেডকে জানিয়ে দিল। টেড একটু তফাতে ছিল। ছুটে এসে রাডার পর্দার দিকে চেয়ে চিৎকার করে উঠল। দে আর কামিং দে আর কামিং ডক্টর গোভার, ওরা আসছে ডক্টর গোভার।

ডক্টর গোভার ডায়েরি লিখছিলেন। ডায়েরি রেখে ছুটে এলেন।

ডক্টর গোভারকে দেখে রাডারের দিকে আঙুল দেখিয়ে টেড বলল।

বাই গড ! লুক অ্যাট দি স্ক্রীন ! দোজ মুভিং ডটস···দেখুন দেখুন ডক্টর গোভার। ঐ যে ঐ বিন্দুগুলো নড়ছে, ওগুলো কি ?

গোলমাল শুনে ড্যান, টোগো ও লিডান ছুটে এল। তারা সকলে রাডার ঘিরে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সত্যিই কি আসছে দানবেরা। ডটগুলো কি তাদের স্পেসশিপ ?

টেড জিজ্ঞাসা করল ঃ ভাল করে দেখুন তো ডঃ গোভার, ওগুলো মিটিয়র নয় তো ?

ডক্টর গোভার কি সব নাড়াচাড়া করলেন তারপর বললেন ঃ

মিটিয়র নয়। উলফেরেনদের স্পেসশিপ কিনা বলতে পারছি

না তবে ওগুলি কোনো চলন্ত বস্তু এবং সেগুলি এথিরিয়ার দিকেই এগিয়ে আসছে।

গোভার তখন তার সেই মাইমোজা যন্ত্রের সঙ্গে রাডার যন্ত্র যুক্ত করল। মাইমোজা যন্ত্রে কি সব সূক্ষ্ম বক্ররেখা তড়িৎ গতিতে ছুটতে লাগল। সেই সঙ্গে ফুটি ফুটি লাল নীল আলো জ্বলতে ও নিবতে লাগল।

ঐ রেখার গতি এবং আলো জ্বলা ও নেবার সময়ের পার্থক্য বিচার করে বললেন ঐ বিন্দুগুলি স্পেসশিপ না হয়ে যায় না কিন্তু ওগুলি প্রচণ্ড গতিতে এগিয়ে আসছে, প্রতি সেকেণ্ডে ২৫০ মাইল।

তাহলে ওরা আসছে এবং প্রধান লিডানের হিসেব মতো পনেরো দিনের মাথায়। বলল টেড।

টোগো বলল ঃ ওরা কখনও অন্ধকারে আমাদের গ্রহে অবতরণ করে নি। ওরা কাল ভোরের আগে আমাদের গ্রহে পৌঁছবে না। ওরা সেই মতো হিসেব করে আসছে।

ওরা এখনও লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে আছে। তবুও আমাদের এখনই এ, বি এবং সি তিনটি জোনেরই যোদ্ধাদের সতর্ক করতে হবে। গোভার বলল।

টোগো মারফত এরিক বলল ঃ আমি তো সারারাত্রি এই রাডারের সামনে বসে থেকে লক্ষ্য করব।

তাকে ড্যান বলল ঃ আরে এই তো সবে সন্ধ্যা। কাল ভোরের আগে ওরা আসছে না। আমরা পালা করে ঘুমিয়ে নোব।

লিডান বলল ঃ এবার আমরা ওদের জন্যে বিশেষ অভ্যর্থনার আয়োজন করেছি, হায় ওরা জানে না যে এবার ওদের জন্যে বিস্ময় অপেক্ষা করছে।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হল। রাত্রি এগিয়ে চলল। ওরা সকলে একে একে রাতের আহার শেষ করে নিল।

যদিও পালা করে ঘুমোবার প্রোগ্রাম করা হয়েছিল কিন্তু কেউ

ঘুমোতে পারছে না। মাঝে মাঝে হাই তুলছে বা ক্ষণিকের জন্যে কেউ ঘুমিয়েও পড়েছে।

লিডান পত্নীও মাঝে মাঝে আসছিলেন। তিনি ওদের এই অবস্থা দেখে বাড়ির ভেতরে চলে গেলেন তারপর একজন পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

পরিচারিকার হাতে কেটলির মতো একটি পাত্র আর তাঁর নিজের হাতে কতকগুলি বাটি।

লিডান পত্নী সেই পাত্র থেকে উষ্ণ পানীয় ঢেলে সকলকে এক বাটি করে দিলেন। ব্যস্, সকলের ঘুম পালিয়ে গেল, তারা নতুন উদ্দীপনায় কাজে মেতে উঠল।

কফি খেলে হয় তো ঘুম পালায় কিন্তু গোভার অথবা টেড এ-রকম পানীয় কখনও খায় নি।

আর পাঁচ ঘণ্টা বাকি আছে।

রাডার ও মাইমোজা যন্ত্র যে ঘরে আছে সেই ঘরে একটা ছোট ট্রান্সমিটার বসানো হল। ঘরখানা কণ্ট্রোলরুমে পরিণত হল।

গোভারের একটা ভয় আছে। সে শুনেছে যে স্পেসশিপ থেকে নেমেই উলফেরেনরা তীব্র বেগে ছুটে আসে। যোদ্ধাদের বলে দেওয়া হয়েছে যে উলফেরেনরা স্পেসশিপ থেকে নামা মাত্রই যেন মেশিন গান থেকে ফায়ারিং আরম্ভ করা হয় এবং পাল্লার মধ্যে যদি কোনো উলফেরেন আসে তাহলে যেন গ্রেনেড ও বোমা ছোঁড়া হয়।

এই কথাটা যোদ্ধাদের আর একবার মনে করিয়ে দেবার জন্যে গোভার লিডানকে অনুরোধ করল। লিডান তৎক্ষণাত তাঁর ট্রান্সমিটার মারফত প্রতি জোনের যোদ্ধাদের কথাটা মনে করিয়ে দিলেন।

তবে গোভার মহড়ার সময় যা দেখেছে তাতে তার বিশ্বাস হয়েছে যে এথিরিয়ান যোদ্ধারা হাতে অস্ত্র পেয়ে তাদের ভীরুতা দূর করতে পেরেছে। তারা ঠিক মতো নির্দেশ পালন করতে পারবে।

রাডারের পর্দায় ছবিটা এবার স্পষ্ট হয়ে উঠল, হ্যাঁ এগুলি

স্পেসশিপ। স্পেসশিপের পশ্চাৎ দিকে অগ্নিশিখা ও ধোঁয়ার রেখাও এবার বোঝা যেতে লাগল।

আর বোধহয় এক ঘণ্টার মধ্যে ওরা এসে পড়বে।

শেষ বারের রতো তদারক করবার জন্যে টেড একটা র‍্যামজেট নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

ক্রমশঃ আলো ফুটছে। দৈত্যরা যখন নামবে তখন রোদও ফুটবে। এখন কোথায় নামবে?

কটা স্পেসশিপ আসছে? লিডান জিজ্ঞাসা করেন।

আটখানা। গোভার বলল।

অন্যবার আসে চারখানা। এবার ডবল, তার মানে মোট ১২০ জন দৈত্য। লিডান একবার পায়চারি করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ

কি গোভার তোমার অস্ত্র ওদের ঘায়েল করতে পারবে তো?

তুমি নিশ্চিন্ত থাক লিডান কিন্তু কথা হচ্ছে যে স্পেসগুলি ঐ তিনটি জোনের একটিতে অবতরণ করবে তো?

তা করবে নিশ্চয়।

যদি গ্রহের বিপরীত দিকে করে?

না, সেদিকে শুধু পাহাড় আর গভীর বন। মানুষের বসতিও নেই। ওধারে ওরা নামবে না। আচ্ছা তুমি কি তোমার এই যন্ত্র দেখে বলতে পারবে কোথায় ওরা নামছে?

তা পারব।

পারবে তো? তাহলে আমিও সেইখানে চলে যেয়ে সৈন্য পরিচালনা করব।

তাহলে আমি আর টেডও যাব।

মাইমোজা যন্ত্র থেকে তার যোগ করে কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে ডক্টর গোভার,রাডারের দিকে চেয়ে আছে।

স্পেসশিপ এসে পড়েছে। এইবার নামবে। গতি অনেক কমেছে। গ্রহের ওপর চক্কর মারছে।

ডক্টর গোভার বলল ঃ ওরা বি জোনে নামবে ?

আমি তাহলে বি জোনে চললুম। বি জোনে পৌছে এ আর সি জোন থেকে সৈন্য ও অস্ত্র সরিয়ে আনব। একটাও উলফেরেন যেন না বাঁচে। ওদের এবার উচিত শিক্ষা দোব।

স্পেসশিপ থেকে ওদের মাটিতে নামতে কত সময় লাগে ?

বেশ কিছুটা সময় পাওয়া যায়। লিডান বলল, আমি কিন্তু বি জোনে চললুম।

আমি আর টেডও যাচ্ছি।

ওরা সবাই যখন বি জোনে পৌছল তখন স্পেসশিপ গুলো মাটি ছুঁই ছুঁই করছে।

শস্যে পরিপূর্ণ সামনে বিশাল প্রান্তর। মাঝে মাঝে ফাঁকা জমি। সকাল হওয়ার সঙ্গে পশুগুলি চরবার জন্যে বেরিয়ে পড়েছিল। এখন স্পেসশিপের ঘর্ঘর আওয়াজে পশুগুলি বিক্ষিপ্তভাবে ছুটতে লাগল।

বি জোনে পৌছেই লিডান এ এবং সি জোনে বেতারবার্তা পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছেন অস্ত্র ও বোমা নিয়ে সমস্ত যোদ্ধা যেন অবিলম্বে বি জোনে চলে আসে কারণ যুদ্ধটা এইখানেই হবে।

এথিরিয়ানরা এবার আর ভয়ে পালাচ্ছে না। যুদ্ধ দেখবার জন্যে তারা দূরে জমায়েত হয়েছে।

যোদ্ধারা যেখানে ঘাঁটি গড়েছিল সেখান থেকে দুই মাইল দূরে স্পেসশিপগুলো সার বেঁধে একটার পর একটা মাটিতে নামল।

মাঝে মাঝে বেশ তফাত রেখে স্পেসশিপগুলো থেমেছে। কিন্তু এখনও দরজা খুলল না।

এ এবং সি জোনের যোদ্ধারা এসে গেছে। তারা বি জোনের যোদ্ধাদের দু পাশে পজিশন নিয়ে মেশিন গান সাজিয়ে এবং বোমা ও গ্রেনেড প্রস্তুত রেখে রেডি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

চারদিকে একটা থমথমে ভাব।

কিন্তু এখনও শয়তানের দল নামছে না কেন ?

হঠাৎ আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে একটা স্পেসশিপ থেকে তীব্র জোরে একটা সাইরেন বেজে উঠল। সাইরেন পৃথিবীতে শোনা যায় এ সাইরেনের আওয়াজ সেরকম নয়। মোটা ও কর্কশ।

সাইরেন বাজার সঙ্গে সঙ্গে স্পেসশিপগুলোর দরজা খুলে গেল আর প্রতিটি স্পেসশিপ থেকে দানবের দল নামতে লাগল।

গোভার ও টেড পালটাপালটি করে দূরবীণ লাগিয়ে দেখল এরা মানব সদৃশ কিন্তু দানব। প্রত্যেকে হাতে একটা করে মোটা গাছ ভাঙা ডাল নিয়ে তীর বেগে ছুটে আসছে।

আরে এ তো গরিলা তবে এদের পৃথিবীর গরিলাদের চেয়ে এদের মাথা বেশ বড় আর গতিবেগও প্রচণ্ড। একশ' গজ পার হতে ওদের পাঁচ সেকেণ্ড লাগছে।

এবার ভিড় দেখে ওদের মুখে উল্লাস কিন্তু তখনও ওরা মেশিন গানের পাল্লার মধ্যে এসে পৌঁছায় নি।

হাতে একটা লাল ফ্ল্যাগ নিয়ে টেড অপেক্ষা করছে। সে বলেছে যেই সে লাল পতাকা উঁচুতে তুলে ধরে নাড়বে আর সঙ্গে সঙ্গে যেন মেসিন গান চালানো হয়।

একশ' গজ লম্বা অর্ধ বৃত্তকার লাইনে পর পর বারোটি মেসিন গান বসানো হয়েছে।

যে রকম তীর বেগে ওরা ছুটে আসছে তাতে মেসিন গানের পাল্লার মধ্যে ওদের পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না।

টেড লাল পতাকা মাথার ওপর তুলে দোলাতে লাগল আর সঙ্গে সঙ্গে র‍্যাট ট্যাট ট্যাট···র‍্যাট ট্যাট ট্যাট করে মেসিন গানগুলি বৃষ্টি করতে লাগল।

কাটা কলাগাছের মতো দৈত্যগুলি মাটিতে লুটিয়ে পড়তে লাগল।

বারোটা মেসিন গান, অজস্র বোমা আর মাত্র একশ কুড়ি জন দৈত্য। তাদের শেষ করতে আর কত সময় লাগে।

যে সব দৈত্যরা আগে ছুটে আসছিল তারা আগে মরল।

পিছনের সারির দৈত্যরা ব্যাপারটা তখনও বুঝতে পারে নি। তারা ছুটেও আসছিল তীব্র বেগে। থামতে থামতেও পাল্লার মধ্যে এসে গেল।

একশ' কুড়ি জন দৈত্যই মিনিটের মধ্যে শেষ।

স্পেসশিপগুলির মধ্যে বোধহয় চালকরা ছিল তারা বোধহয় নামে না। তারা বোধহয় কেবিনে বসে সব কিছু লক্ষ্য করছিল। এ রকম ব্যাপার তারা আগে দেখে নি।

সহসা সেগুলি চঞ্চল হয়ে উঠল এবং কয়েক মিনিট পরেই ঘটনা ঘটল। মর্মান্তিক এবং অতিশয় দুঃখজনক।

স্পেসশিপগুলি আকাশে উঠল কিন্তু একটা এথিরিয়ানদের দিকে এগিয়ে এল। খুব নীচু দিয়ে সেটা ছুটে আসছে।

টেড সহসা ছুটে গিয়ে একটা মেসিন গানের নল উঁচু করে তুলে ধরে গুলি চালাতে লাগল।

স্পেসশিপটা তৎক্ষণাত ভেঙে পড়বে এমন আশা টেড করে নি। সেটা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

আর সেই সঙ্গে বেশ কিছু এথিরিয়ানের সঙ্গে ডক্টর রিচার্ড গোভার চাপা পড়ে গেলেন। একজনও বাঁচল না।

এই ঘটনার সাতদিন পরে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে অ্যাণ্ডিজ পাহাড়ের ওপর যেখান থেকে এথিরিয়ানরা তাদের ফ্লাইং সসারে করে ডক্টরকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল সেইখানে একটা কফিন ও একটি প্যাকেট ও কয়েকটি যন্ত্রপাতি দেখা গেল।

ঐগুলি দেখে স্থানীয় একজন অধিবাসী অপারেশন ডায়না স্টেশনে জে পি স্মিথকে খবর দিয়েছিল।

কফিন খুলে পাওয়া গেল ডক্টর রিচার্ড গোভারের মৃতদেহ। যন্ত্র-গুলি হল তার নিউটন ও মাইমোজা এবং সেই প্যাকেটে ছিল ডক্টর

গোভারের ডায়েরি এবং টেড মিলারের বিস্তারিত একটি চিঠি হিউ নিউবেরিকে লেখা।

শেষ দিনের ঘটনা এবং কিভাবে ডঃ গোভারের মৃত্যু হল সেই কথাই সে লিখেছে। সে নিজে আর ফিরবে না। এথিরিয়াতে একটি মেয়েকে তার পছন্দ হয়েছে।

এথিরিয়ার এই সব খবর আমরা ডক্টর রিচার্ড গোভারের ডায়েরি পড়ে জানতে পেরেছি।

ডঃ গোভারের সেই ডায়েরি আমেরিকার বিখ্যাত স্মিথসোনিয়ান ইনষ্টিটিউটে সযত্নে রক্ষিত আছে।

কিন্তু পৃথিবীতেও ফ্লাইং সসার তৈরি হয়েছিল।

জার্মানির এয়ার ফোর্সের তিন জন গবেষক স্রিভার, হেবারমল এবং মিটে বিরাট ব্যাসের ফ্লাইং ডিস্ক তৈরি করেছিল।

১৯৪৫ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে সেটিকে আকাশে ওড়ানো হয়েছিল। জার্মানিতে নয়, প্রাগ শহরে। সেটির গতি ছিল ঘণ্টায় ১২৫০ মাইল এবং তিন মিনিটের মধ্যে আট মাইল উর্ধ্বে উঠতে পারত।

যুদ্ধের পরে নাকি রাশিয়ানরা হেবারমলকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

মিটেকে নিয়ে গিয়েছিল আমেরিকানরা। সেখানে সে এ ভি রো কোম্পানীতে অপরূপ ফ্লাইং সসার তৈরি করেছিল। এ খবর আমেরিকানরা আজও গোপন রেখেছে।

****